www.amarboi.com

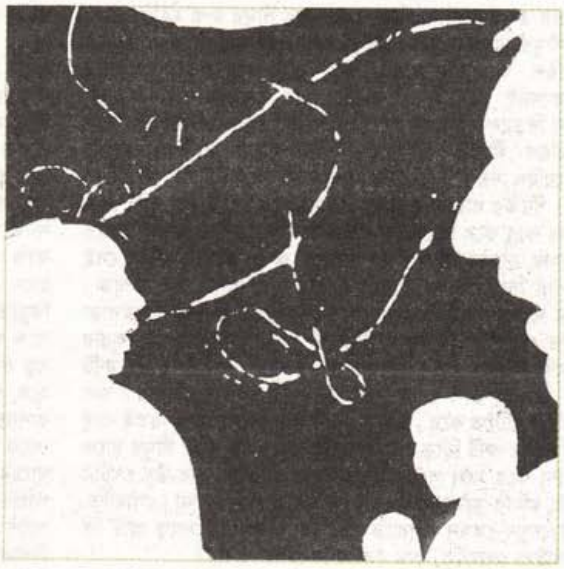

সচিত্রকরণ : আফজাল হোসেন

আনিসুল হক

না-মানুষি জমিন

আমারবই.কম

সীমুর জন্ম হয়েছিল ভোরবেলা। শীতের ভোরবেলা। না-মানুষি জমিনে। সীমান্তে জন্ম বলে তার নাম সীমানা। সেখান থেকে সংক্ষেপিত হয়ে সীমা, অতঃপর সীমু। আর কোনো পদপদবি নাই। সাত বছরের এই মেয়েটি হলদিবাড়ি কিংবা নলচেপাড়া এলাকায় প্রচলিত অভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলে। তবে সে মেড়ো ভাষাটাও ভালোই রপ্ত করেছে। মেয়েটি বসবাস করে না-মানুষি জমিনে, একটা ছইয়ের নিচে। ওই ছইটিই বা সে কোথায় পেল, তা একটা প্রশ্ন বটে। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে লোককথায়, মানুষের মুখে মুখে, কিংবা হরিহর মজুমদারের লেখায়। সেসব কথায় নানা রং, মুখ থেকে কথা কানে, কান থেকে মুখে এলে রং বদলাবেই। কিন্তু বাস্তবে আপনি যখন দেখবেন হলদিবাড়ির সীমান্ত চৌকির পরে কাঁটাতারের বেড়ার ওই পারে, কিংবা নলচেপাড়ার সীমান্ত চৌকি পেরিয়ে, শূন্যরেখার দুই পারের না-মানুষি জমিনে, যে জায়গাটা কোনো মানুষেরই নয়, সেইখানে একটা ছই, আর সেই ছইয়ে একটা মানবশিশু চলাফেরা করছে, তখন আপনার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হতে বাধ্য। আর এও জানবেন যে, সে রানির প্রতিপালক। রানি একটা বাঁদরের নাম। রানির বয়স এখন ২২। সম্মিলিত মানুষের স্মৃতি, যাকে আমরা কিংবদন্তি বলতে পারি, তা বড়ই পরিবর্তনশীল। চার বছর আগে এই এলাকায় এলে আপনি শুনতে পেতেন, একটা বাঁদর একটা মানুষের বাচ্চাকে লালন-পালন করে। কিন্তু চার বছরের মধ্যেই কর্তা আর কর্ম পরস্পরকে প্রতিস্থাপন করেছে। এখন লোকে বলে, একটা ৬-৭ বছরের বালিকা একটা বাঁদরকে প্রতিপালন করে।

সীমুর জন্মদিনটা নিয়ে উভয় পারের মানুষই নানা কথা বলাবলি করে। হলদিবাড়ি কিংবা নলচেপাড়া সীমান্ত এলাকায় সেই দিন ছিল ঘন কুয়াশা। এমন শীত পড়েছিল যে উভয় পারের লোকেরা মনে করতে পারে সেই বছরের কথা, যে বছর শীতে বাঁশঝাড়ে বাঁশের পাতা ঝরে পড়ার মতো মরা শালিক পাখি ঝরে পড়েছিল। তা একটা বাঁশঝাড় ছিল বটে, সীমান্তের উভয় পারেই। সেই বাঁশঝাড়ে ওই শালিক পাখিরা বসবাস করত। সেবার এমনি শীত পড়েছিল যে শালিকেরাও বাঁশের কঞ্চির নিরাপদ আশ্রয় থেকে ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়েছিল। আর ছিল কুয়াশা। এমন কুয়াশা যে, চারদিক সাদা হয়া গেছিল বাহে, এক হাত কি আধা হাত দূরতও কোনো কিছু দেখা যায় না। খালি সাদা আর সাদা। আন্ধার যে সাদা হইতে পারে বাহে, ওই দিন হামরা বুঝছিনো। উভয় পারের মানুষ আজও এমনি কথা উচ্চকণ্ঠে পরস্পরকে শোনায়। তারই মধ্যে হলদিবাড়ির মানুষেরা প্রাতঃকৃত্য সারতে বাঁশঝাড়ের হলদিবাড়ি অংশে, আর নলচেপাড়ার মানুষেরা বাঁশঝাড়ের নলচেপাড়া অংশে প্রতিদিনকার মতো আড়াল খুঁজে বসতে গিয়ে দেখতে পায় শালিকের লাশ, একটার ওপরে একটা। সেই দিনকার এই অভিজ্ঞতার অভিন্নতা দুই অংশের মানুষের মধ্যে কীভাবে বিনিময় হয়, তা আমরা জানি না। হয়তো বটেশ্বরের মেলার দিনে যে দুপারের সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়, ওপারের মানুষেরাও এপারে আসে বটেশ্বর পর্যন্ত, সেদিনই এই সব কথা আদানপ্রদান হয়ে থাকবে। তা বটেশ্বরও তো এই সীমান্ত খুঁটি থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণে। কাজেই এই কথার যে ডালপালা ছড়াবে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে, মোদ্দা কথা হলো, দুপারের মানুষেরই স্মৃতির মধ্যে এটা স্থায়ী হয়ে গিয়েছে যে যেইবারে শালিক মরিয়া বাঁশতলা ঢাকিয়া ফেলছিল, হাগামোতার জায়গা থোয় নাই, আর সোগ কিছু সাদা হয়া গেছিল, আর খুব হ্যাল পড়ছিল, ঠান্ডাত সোগ কিছু বরফ হওয়ার জোগাড়,

www.amarboi.com

চাদরের তলতও ম্যালা শীত, সেই বছর সীমুর জন্ম হইছিল।

সীমুর মাকে নলচেপাড়ার সীমানা প্রহরীরা ট্রলিতে করে ধরে এনেছিল আগের রাতে। সেই কথা নলচেপাড়া অংশের লোকেদেরই মনে আছে ভালো। ওই কুয়াশাঢাকা সাদারাতে কালো বিড়ালের চোখের মতো হেডলাইট জ্বেলে একটা লরি এসে থেমেছিল সীমান্ত চৌকিতে। নলচেপাড়ার প্রহরীরা তাদের নামিয়েছিল সন্তর্পণে। তাদের মধ্যে জনা বিশেক নারী পুরুষ শিশু ছিল। শীতের রাতের কুয়াশা তাদের ঢেকে রেখেছিল, আর শীত তাদের কাবু করে ফেলেছিল। লরি চলছিল, তাদের মাথার ওপরে ত্রিপলের ঢাকনা ছিল, কিন্তু বাতাস হু হু করে ঢুকছিল সেই ঢাকনার নিচে, কারণ সামনে-পেছনে দুই পাশই ছিল উন্মুক্ত। সীমুর মায়ের অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়। এ কথা নলচেপাড়া সীমান্ত প্রহরা ইউনিটের লঙ্গরখানার রসিকলাল পরে অনেকবার বলাবলি করেছে বটে। রসিকলাল এই নারী পুরুষ শিশুদের রুটি আর ছোলার ডাল খেতে দিয়েছিল শাল পাতার ঠোঙায়। জল দিয়েছিল ঘটিতে করে। এই ইল্লিগাল মানুষগুলো শীতে এতই কাবু হয়েছিল যে রুটি ছিঁড়ে খেতে পারছিল না। এর মধ্যে সীমুর মাকে আলাদা করে মনে পড়ে, কারণ টর্চের আলোয় তার উঁচু পেটটা একটা ধামার মতো লাগছিল। সে চলতে পারছিল না। পোয়াতি, মানে যেমন-তেমন পোয়াতি তো নয়, একেবারে সাড়ে আট কি নয় মাইসা পোয়াতি, তার তো যখন-তখন অবস্থা!

সীমুর মায়ের নাম ছিল পল্টুর মা। এই নামেই তাকে ধরে আনা হয়েছিল, নলচেপাড়াবাসীদের যে রাজধানী শহর, যে শহর এই নলচেপাড়া থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, সেখান থেকে। পল্টুর মা অন্যদিনের মতোই সেদিন ওই রাজধানীর বিখ্যাত দরগা এলাকার গলিতে মিঠাইয়ের দোকানে কাজ করেছে, এই কথা তার বস্তিবাসীদের মধ্যে আর যারা ধরা পড়েছিল, তারা বলবে, নলচেপাড়ার দোকানদার বিশু এই কথাটাই সবচেয়ে বেশি মনে রেখেছে, কারণ সেও মিঠাই বিক্রি করে নলচেপাড়ার বাজারে, যদিও তার দোকানে এটা-সেটা মনোহারি জিনিসপত্রও পাওয়া যায় কিছু কিছু এবং সেসব জিনিসপাতির অনেকগুলোই আসে ওই হলদিবাড়ির দিক থেকেই। নলচেপাড়ার গ্রামপঞ্চায়েত ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হরিহর মজুমদার একজন সুসাহিত্যিক। তিনি তাঁর বাঁধানো খাতায় পল্টুর মা থেকে সীমুর মা হয়ে ওঠা নারীটির সেই দিনগুলোর বর্ণনা নিজের কল্পনার বল্গা আলগা করে বিস্তারিত দাঁড় করিয়েছেন। তবে তাঁর বর্ণনার পুরোটাই কাল্পনিক নয়, এ দাবি করেন দৈনিক *সীমান্ত জনপদ* পত্রিকার রিপোর্টার পরিমল মজুমদার, বর্তমানে মেরুদণ্ডের জখম নিয়ে যিনি একেবারেই শয্যাশায়ী। তিনি বলেন, ওই উদ্বাস্তুদের ধরে আনা হয় নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে করে, নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে তাদের নামানো হয় পুলিশ প্রহরায়, তারপর তাদের তুলে দেওয়া হয় সীমান্তরক্ষীদের হাতে, তারা তাদের একটা লরিতে তোলে। এই উদ্বাস্তুদের যখন নলচেপাড়ার সীমান্ত চৌকিতে আনা হয়, তখন ওই চৌকির পার্শ্ববর্তী হোমিও চিকিৎসক বাসুদেব ধরের আরোগ্য নিকেতনে হরিহর মজুমদারের ছোট ভাই সাংবাদিক পরিমল মজুমদার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, এক ফোঁটা আর্নিকার ড্রপ নিয়েছিলেন এক বোতল জলে। তার স্ত্রীর বাতের ব্যথা, আর্নিকায় কাজ হয়, এক বোতল জলে এক ফোঁটা আর্নিকা পড়ার শব্দটা ঢেকে যায় লরির শব্দে, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে লরি এসে থামে আরোগ্য নিকেতনের সামনে। আরোগ্য নিকেতনের উল্টো পিঠেই একটা চায়ের দোকান, তাতে একটা টেলিভিশন চলছিল, ওই সময় সিনেমা দেখানো হচ্ছিল, *গুরুদক্ষিণা*, আর উত্তরের প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে *গুরুদক্ষিণা* ছবিটা দেখার প্ররোচনায় চায়ের দোকানে কিছু ছেলে-ছোকরা, নবীন-প্রবীণ, এমনকি ৮০ বছরের ক্ষিতিচরণ চাদর মুড়ে হাজির হয়েছিল। কাছেই সীমান্তরক্ষীদের ফাঁড়ি, টানা পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের ঘর। ওপরে ঢেউটিন। তাতে লাল রং। আমগাছ, নারকেলগাছ, সুপুরিগাছ যা আছে ওই ফাঁড়ির সামনে-পেছনে, উঠোনে, টিনের চাল ছেয়ে—সবগুলোরই নিচে চুনকাম করা। এ হলো গাছের উর্দি, হরিহর মজুমদারের টীকা। পরিমল মজুমদার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁর কাছ থেকেই বিস্তারিত বিবরণ শুনে দাদা ওই ডায়েরি রচনা করেছেন, পরিমল তা-ই দাবি করেন। হরিহর বলেন, এ আমার নিজের রচনা, এইটা ফিকশন। রিপোর্টার তো মানুষের মন নিয়ে কারবার করতে পারে না, শিল্পী কবি সাহিত্যিকেরা পারে, দেখেন, আমি কী রকম অন্তর্যামীর মতো পল্টুর মা, ওরফে সীমুর মা, ওরফে পোয়াতিটার চোখ দিয়ে সমস্ত ঘটনা তুলে ধরেছি।

পল্টুর মা অন্যদিনের মতোই দরগা রোডে মিঠাইয়ের দোকানের রান্নাঘরের পেছনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যায়। তার পেটে সাড়ে আট মাসের বাচ্চা, যেকোনো সময় সে বিয়োতে পারে—এই ভাবনা পল্টুর মায়ের ছিল। কিন্তু হিসাবমতো আরও দুই সপ্তাহ পরে তার প্রসবের সময় আসবে, দাই এসে পেট নেড়েচেড়ে পেটে কান দিয়ে বাচ্চার নড়াচড়া শুনে তা-ই বলেছিল। এই জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার প্রায়, মাথার ওপরে একটা ষাট পাওয়ারের বাতি আছে বটে, কিন্তু কাঠের চুলার আগুন আর ধোঁয়া দেয়ালে-ছাদে এত কালিঝুলি সৃষ্টি করেছে যে এই প্রকোষ্ঠের অন্ধকার কিছুতেই দূর হয় না। বড় কড়াইটা কলের নিচে, কল থেকে ছরছর শব্দে পানি ঝরছে, সেই কড়াইয়ের মধ্যে ছোট-বড় বাসনকোসন, বড় বড় চামচ, হাতা, খুনতি। একটার পর একটা বাসন মাজতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে পল্টুর মাকে। কাঠের চুলার ছাই দিয়ে বাসনকোসন মাজে পল্টুর মা, রোজ এই কাজ করে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, পানি নাড়তে নাড়তে তার হাতের আঙুল বেলে মাছের মতো নীরক্ত হয়ে যায়, তার নখ গেছে ক্ষয় হয়ে। চুলার আগুন জ্বলতে থাকে, হেড কারিগর ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে চুলার পাশে দাঁড়িয়ে কড়াইয়ে তেল ঢালে, চিনি কিংবা ময়দা ঢালে, বিশাল খুন্তি দিয়ে কড়াইয়ের ভেতরের বিভিন্ন উপাদান নাড়ে, চুলার আগুনে হেড কারিগরের কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোঁটা ফোঁটা তরল আগুন বলে মনে হয়, পল্টুর মা তখন তার বিশাল পেটটা সামলে নিয়ে এটা-ওটা ধোয়। ইদানীং তার বড্ড খিদে পায়, কারিগরের চোখ এড়িয়ে সে একটা লাড্ডু মুখে পুরবে কি না, এই রকম একটা ভাবনা তার মাথার মধ্যে উঁকি দেয়। তখন তার পল্টুর কথা মনে পড়ে। পল্টুর বয়স ৮ বছর, এরই মধ্যে সে কাওয়ালির দলে ভিড়ে গেছে। তবে তারও আগে, তার বয়স যখন চার কি সাড়ে চার, তখন থেকেই পল্টু দরগা লেনে ভিক্ষা করত; হাতে থাকত ফুল, টুপি, আতর, লোবানকাঠি—যখন যেটা কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সারি সারি দর্শনার্থী আসে দরগায়; নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা ভাষার, এমনকি সাদা চামড়ারা আসে, ইংরেজিতে বলে, থ্যাংক ইউ। তাদের পেছন পেছন ছুটত পল্টু, 'সাহেব, হুজুর, বাবু, স্যার, টেক দিস স্যার,' পেছন পেছন জোঁকের মতো লেগে থাকলে কেউ না কেউ দয়াপরবশ হয়ে তার হাতে একটা-দুটা রুপি তুলে দিত, এই দরগা শরিফের আউলিয়া কাউকে তো আর নিরাশ করে না। লোবানকাঠি বিক্রি অথবা ভিক্ষাবৃত্তির কাজে পল্টুর আয়-রোজগার ভালোই হতো, কিন্তু তার একটা আশ্চর্য প্রতিভা ছিল, যেটা লোকগোচর হতে লাগল ধীরে ধীরে—পল্টু যখন গলা ছেড়ে কাওয়ালি গাইতে শুরু করল, তখন সবাই তাজ্জব বনে গেল, এই রকম গলা, এ যে মধুর চেয়েও মিষ্টি, লতা মুঙ্গেশকরের চেয়েও সুরেলা। তোরি সুরাত কে বালহারি নিজাম...অ্যায় খুদা...। কী তার গলার জোর, কী তার টান। পল্টুর মা নিজেই বিস্ময় মানে, তার নিজের পেটের ছেলে এই সুরেলা কণ্ঠস্বর পেল কোথায়। হয়তো তার জন্মের পর মা তার মুখে মধু দিয়েছিল বলেই এই রকম মধুকণ্ঠী হয়েছে পল্টু। এখন পল্টু সকাল সকাল চলে গেছে দরগায়, মাজার শরিফ চত্বরে যে কাওয়ালরা বসে, তাদেরই একটার দলে সে বসে আছে। রীতিমতো বাচ্চা একটা কাওয়াল সে, পরনে চোস্ত পাজামা, গায়ে হলদে পাঞ্জাবি, তার ওপরে নীল রঙের কোটি, জরির কাজ করা, চুমকি বসানো, মাথায় লাল সিল্কের টুপি, তার ওপর সোনালি-রুপালি সুতার কারুকর্ম। কাওয়ালদের সঙ্গে বসে সেও গলা ছেড়ে টান ধরে। গলা সে পুরোই ছাড়ে, কাওয়ালিতে টান দেয় প্রত্যেকটা অন্তরার শেষে, কিন্তু পারিশ্রমিক সে পায় খুবই কম। তার ওস্তাদ বলেছে, এখন তার শেখার সময়, এখন সে যদি টাকাকড়ির মুখ দেখে তাহলে তার প্রতিভা, আল্লাহর দান, আউলিয়ার দোয়ায় যা সে পেয়েছে, তা ঠিকমতো বিকশিত হওয়ার আগেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। পল্টু সকালবেলা সেই যে দুটো রুটি মুখে দিয়ে বেরিয়েছে, এখন কি তারও খিদে পায়নি! কাজেই একটা লাড্ডু মুখে পোরার লোভ পল্টুর মা সংবরণ করে। বরং ফেরার সময়, ভাঙাচোরা মিঠাইয়ের কিছু কিছু সে তো নিয়ে যেতেই পারে, যদিও এক কণা মিষ্টিদানাও নষ্ট করা হয় না, পরের দিনের মিষ্টান্নের সঙ্গে সব মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবুও চাইলে সে কি একটা গজা কি কিছু মিহিদানা তার ছেলেটার জন্য একদিন নিয়ে যেতে পারে না?

www.amarboi.com

দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, তখন তার অবসর জোটে দুপুরের খাবার খাওয়ার। দুপুরবেলা সব বাসনকোসন এসে জমে, বিকেলবেলা আবার চুলায় ওঠে কড়াই, তার জন্য সবকিছু ঘষেমেজে পরিষ্কার করে তারপর তার অবকাশ জোটে কিছুক্ষণের জন্য। পাশের তন্দুরির দোকানের গরম তন্দুরি তাদের তিন কর্মচারীর জন্য বরাদ্দ। সঙ্গে ছোলার ডাল। পল্টুর মা কেবল একটা থালায় তন্দুরি নিয়ে তরকারির বাটিতে ছোলার ডাল ঢেলে খেতে বসেছে, সেই সময়ই তাদের দোকানে ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। পুলিশ এসে ঘিরে ফেলে দোকানটা, সামনে ইনফরমার, তারা সোজা দোকানের পেছনে রান্নাঘরে চলে আসে, তাকে তারা খপ করে ধরে ফেলে, তারা তাকে বলে, তুমি এই দেশি নও, তুমি বিদেশ থেকে এসেছ, তুমি অবৈধ, পল্টুর মা বলে যে না, সে এ দেশের, তারা বলে, আমাদের কাছে নিশ্চিত খবর আছে, তুমি ওই পার থেকে এসেছ, সে বলে, আমার রেশন কার্ড আছে, ভোটার লিস্টে আমার নাম আছে, তারা পল্টুর মায়ের কাছে রেশন কার্ড দেখতে চায়, দোকানের অন্য দুজন কর্মচারীকে তারা কিছুই বলে না, কিন্তু তাদের তারা জোরে ধমক দেয়, বলে, ইল্লিগাল মাইগ্রান্টকে কাজ দিয়েছ কেন, পল্টুর মা বলে, আমার কার্ড আমার ঘরে আছে। তখন পুলিশ সদস্যটি, লম্বা, তামাটে বর্ণ, নিখুঁত মোমপালিশ করা গোঁফ, চৌকো মুখমণ্ডল, দাবানো গাল, লাঠি উঁচিয়ে বলে, তা হলে মোকামেই চলো। ডালের বাটি উল্টে যায়, তন্দুর রুটি মাটিতে ছিটকে পড়ে, পুলিশের সঙ্গে পা মেলাতে কষ্ট হয় পল্টুর মার, সবার আগে তার উঁচু পেটটাই চলতে থাকে। তার বস্তিঘরটা মিঠাইয়ের দোকান থেকে বেশি দূরে নয়, পল্টুর বাবা কাজ করে এমব্রয়ডারির ফ্যাক্টরিতে, তাদের বিয়ে হয়েছে বছর দশেক আগে, পল্টুর বাবাও সাতসকালে উঠে কাজে গেছে, তার কাছেই তাদের টিনের ট্রাংকের চাবি থাকে, তবুও ঘরে গেলে ট্রাংকের তালা কোনো একভাবে খোলা অসম্ভব নয়, হয়তো তালা ভাঙতে হতে পারে।

কিন্তু পল্টুর মা পুলিশ ও ইনফরমার সমভিব্যাহারে যখন তার বস্তিঘরে পৌঁছায়, তার আগেই তাদের বস্তিঘর লুট হয়ে গেছে, কারণ এরই মধ্যে ঘরে ঘরে পুলিশি অভিযান এই বস্তিতে সম্পন্ন হয়ে গেছে, আর পুলিশ চলে যাওয়ার সাথে সাথে সুযোগসন্ধানী কিছু লোক সেই সব ঘরে ঢুকে যা পেয়েছে, লুট করে নিয়ে গেছে। বস্তিটা সরকারি জমিতে অবৈধভাবে গড়ে তোলা, ওপরে ড্রাম পিটিয়ে সোজা করা শিটের চাল, পাশে বাঁশের বেড়া, কার্ডবোর্ড, পলিথিন, ড্রাম পেটানো লোহার পাত, চট, চাটাই। গায়ে গায়ে লাগানো একেকটা ঘর, পায়খানা গোসলখানা আছে এক লাইনের মাথায় একটা, নোংরা আবর্জনা চারদিকে, বিদঘুটে গন্ধে বাতাস ভারী, তবুও সেটা আবাস তো বটে, তাদের তিনজনের সংসার ঠিকই চলে যায় এই ছোট্ট চালাঘরটায়। পল্টুর মা ঘরে গিয়ে দেখে ঘরের দরজা খোলা, আর তার টিনের ট্রাংকটা নাই। কাজেই সে রেশন কার্ড দেখাতে পারে না। পল্টুর মাকে বস্তির বাইরে আনা হয়, লরিতে তোলা হয়, মোটা পেট নিয়ে লরিতে উঠতে তার কষ্ট হয়, তবু সে শ্রমজীবী নারী, কায়িক শ্রম তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। আরও কয়েকজন বস্তিবাসী ও বস্তিবাসিনীকে পল্টুর মা লরিতে দেখতে পায় বটে, কিন্তু তার পল্টু বা পল্টুর বাবাকে সে দেখতে পায় না। সে তখন বলে, আমার স্বামী আর আমার পল্টুকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তোমরা যদি নিতেই চাও, তা হলে আমার ছেলে আর ছেলের বাবাকে সমেতই নাও। পুলিশ তার কথায় পাত্তা দেয় না। সে লরি থেকে নামার চেষ্টা করলে তার দুই হাত পেছন থেকে বাঁধা হয়। তখন পল্টুর মা আর লরি থেকে নামার কোনো উপায় করে উঠতে পারে না। পল্টুর মাকে থানায় আনা হয়।

পল্টুর মার ভীষণ শীত করতে থাকে। থানার লাল মেঝের শান তার কাছে লাল রঙের আইসক্রিমের মতো ঠান্ডা বলে ঠাওর হয়। সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার কেবল মনে হতে থাকে পল্টুর মুখখানি, পল্টু যে এত আউলিয়া আউলিয়া বলে কাওয়ালি গায়, আউলিয়ার দোয়ায় খুদা কি তাদের রহম করবে না? পল্টুর বাবা কাজ থেকে ফেরে রাত ১০টায়, তখন কি সে তার নিজের রেশন কার্ডটা নিয়ে থানায় আসবে না? থানায় এসে পল্টুর বাবা যদি নিজেকে তার স্বামী বলে দাবি করে, তখন পুলিশ কি সদয় হয়ে তাকে ছাড়বে না?

হরিহর মজুমদার কাহিনিটা ভালোই সাজিয়েছেন বলতে হবে। তিনি এই কাহিনি লিখে রাখেন বোধিনী বাউন্ড বুক নামের রুল টানা খাতায়। তাঁর হাতের লেখা মুক্তার মতো ঝকঝকে। হরিহর মজুমদার ফাউন্টেন পেন ছাড়া লেখেন না। তাঁর দোয়াত থেকে কালি পড়ে খাতার একটা অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও এই কাহিনি অক্ষত থেকে যায়।

পল্টুর বাবা কিছুই জানে না। রাত ১০টায় ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে সে আসে তাদের বস্তিতে। এসে দেখে তাদের ঘর খোলা, আর ঘরে জিনিসপাতি প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই। তছনছ করা সেই ঘরে তক্তপোশে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে পল্টু। পড়শিদের মুখে সে শোনে যে তার স্ত্রীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, এখন তাকে যেতে হবে থানায়, যদি সে পল্টুর মাকে আদৌ ফিরে পেতে চায়। পুলিশ স্টেশনে যেতে হলে তার রেশন কার্ড লাগবে, সেটা যাতে কখনো হারিয়ে না যায় সে জন্য সেটা সে সব সময় রাখে ট্রাংকের ভেতরে, কথাটা মনে হতেই ট্রাংকটা যে জায়গায় রাখা ছিল সে সেদিকে তাকায়। এবং এক গভীর শূন্যতা সে ওই স্থানে এবং তার হৃৎপিণ্ডের ভেতরে অনুভব করে। ঘরে বিদ্যুৎবাতি ঝুলছে ঢেউটিনের চাল থেকে, তারই আলোয় সে দেখতে পায় ট্রাংক রাখার জায়গাটায় একটা চারকোনা দাগ পড়ে গেছে, চারদিকে কালো, মধ্যখানে একটা পুকুরের মতো সাদা জায়গা, যেখানে ট্রাংকটা ছিল বলে ধুলোবালি কালিঝুলি পড়েছে কম, ট্রাংক নাই, একদা যে ছিল তার চিহ্ন রয়ে গেছে, ট্রাংকটায় টাকাপয়সা জমা ছিল কিছু, কিছু গয়নাগাটি, কিন্তু সবচেয়ে জরুরি জিনিস যেটা ছিল তা হলো তার রেশন কার্ড, যেটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার। এখন পল্টুর বাবা কী করবে? পল্টুর মার খোঁজে বের হবে। তা হলে কি পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। কনকনে বাতাস বাইরে। কুয়াশাও পড়েছে খুব। পল্টুর বাবা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, ধ্বস্ত। পল্টুরও নিশ্চয়ই খাবার জোটেনি। পল্টুর বাবা ছেলেটার জন্য রুটি কিনতে বের হয়। এত রাতে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। শীতের ভয়ে দোকানিরা দোকানপাট বন্ধ করে যার যার ঘরে ফিরে গেছে। একমাত্র সিনেমা হলের সামনে যদি কোনো খাবারের দোকান খোলা থাকে! সেকেন্ড শো সবে ভেঙেছে হয়তো। সিনেমা হলের সামনে এখনো লোক থাকার কথা। পল্টুর গায়ে কম্বলটা ভালোমতো চাপিয়ে দিয়ে ছেলেকে রেখেই বেরিয়ে পড়ে পল্টুর বাবা। মাথায় মাংকি টুপি। গায়ে মোটা জ্যাকেট। পরনে মোটা কাপড়ের প্যান্ট। পায়ে স্যান্ডেল। দু টুকরো পাউরুটি যদি মেলে কোথাও!

রাতের বেলা পল্টুর বাবা পুলিশ স্টেশনে হাজির হয়নি। বস্তির সর্দার কালু মিস্তিরির কাছে বরং যাওয়াটাকে সে কর্তব্য বলে বোধ করে। কালু মিস্তিরিকেই তারা বস্তিঘরের ভাড়া দেয়। কালু মিস্তিরিই তাদের নাম ভোটার লিস্টে তুলেছে। কালু মিস্তিরির কথামতোই তারা ভোট দেয়। কালু তখন বস্তির শেষ মাথার ক্লাবঘরে। মুরগির কাবাবে কামড় দিয়ে রাম গিলছে। তার দুপাশে দুজন মেয়েমানুষ। তারা চোলি ঘাগরা পরা। চোলি ঘাগরার রং লাল হলুদ সবুজ, তাতে চুমকি কাচ পুঁতি পাথর ইত্যাদি বসানো। তাদের হাতে রঙিন চুরি, তারা মিস্তিরির পা টিপছে, আর তাদের হাতভরা চুড়িতে নিক্কণ উঠছে। ঘরটায় দুটো হলুদ বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, তার আলো মেয়েমানুষ দুটোর জামায় বসানো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ঘরময় আলোর ছিটা ফেলছে। পল্টুর বাবা বলে, সর্দার, আমার মাথায় আসমান ভেঙে পড়েছে, এটা কী ধরনের কথা যে, পুলিশ আমার পত্নীকে ধরে নিয়ে গেছে। বউটা পোয়াতি, পল্টু একলা ঘরে পড়ে আছে এতিমের মতো, আমি কি ঘরভাড়া দিই না, আমি কি ভোট দিতে যাই না আপনার কথামতো? এটা কি অবিচার নয় যে তারা একটা এই রকম পোয়াতি ধরে নিয়ে গেল? এখন আমি কী করব সর্দার? আপনি কী বলেন? আমি কি যাব থানায়?

সর্দার বলে, না, তুমি থানায় যাবে কি? তুমি গেলে তোমাকেও আটকে রাখবে। আজ বেশি রাত হয়ে গেছে। কাল সকালে জামিনের জন্য মুভ করব। আজ যাও। ঘরে গিয়ে ঘুম দাও।

পল্টুর মা থানায় আছে নাকি নাই, এই অবস্থায় খেতে পেল নাকি একটা বিছানা পেল, না জেনে ঘরে যাব? ঘুম দেব? সর্দার তুমি এটা কী বললে?

কালু মিস্তিরি বলে, আরে ইয়ার, তোমার দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে, রাতের বেলা তুমি নিজে গিয়ে বাঘের গুহায় মাথা পেতে দিতে চাচ্ছ, কী রকম শীত পড়েছে দেখেছ, নাও একটু রাম খাও, তোমার শরীরটা একটু তাতিয়ে নাও। পল্টুর বাবা গেলাসে হাত

www.amarboi.com

দেয় না, দুই মেয়েমানুষ তখন কালু মিস্তিরির দুই হাঁটুতে বসে হি হি হি করে হাসে।

পল্টুর কথা পল্টুর মা বারবার বলেছে। তাকে যখন জোর করে লরিতে তোলা হয় আবারও, পরের দিন ভোরবেলা, সকাল সাতটার ট্রেন ধরার জন্য ভোররাত পাঁচটায় যখন তাদের কোমরে দড়ি দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বের করা হয় থানার সামনে, তখন পল্টুর মা বলে, আমার পল্টুর কাছে আমাকে একটু নিয়ে যাও। আমার পল্টু বাড়ি ফিরেছে কি ফিরে নাই, খেয়েছে কি খায় নাই, আমাকে নিয়ে যাও। পুলিশ তার কোমরে দড়ি পরাতে এসে দেখে তার কোমরে দড়ি লাগবে ডাবল, তখন তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে সেই কড়ার ভেতর দিয়ে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে অন্য বন্দীর কোমরে পেঁচানো হয়। এদের মধ্যে নারী আছে, শিশু আছে, পুরুষ মানুষ নানা বয়সের তো আছেই। দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক পাল ভেড়ার মতো তারা একজনের পেছনে একজন হাঁটে, পল্টুর মার উঁচু পেট এই কাফেলার গতি শ্লথ করে দেয়। তারা লরিতে ওঠে, তখন রাজধানী প্রায় পুরোটাই ঘুমন্ত, রাজপথের আলোকস্তম্ভগুলো তখনো অন্ধকারের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো লড়াই করে চলেছে, দু-একটা গাড়ি যা চলছে, সবগুলোই চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। রেলস্টেশনের ভেতরটা বৈদ্যুতিক আলোয় ঝকঝক করছে, তার মেঝে এত চকচকে যে মনে হয় এখনই পা যাবে পিছলে, কোন দিক দিয়ে তারা কোথায় যায়, সে এক এলাহি কাণ্ড, কিন্তু মানুষের পেছনে পেছনে হাঁটলে শুধু মানুষের পিঠ ছাড়া আর কিছু দেখে নেওয়ার দরকার পড়ে না। একটা ঘরে তাদের রাখা হয় কিছুক্ষণের জন্য, ছোট ওই ঘরটায় একগাদা মানুষ গাদাগাদি করে থাকার ফলে পল্টুর মার শরীরে ওম লাগে, তার শীতে অসাড় শরীরটা ধাতস্থ হতে থাকে, সে যেন গলায় জোর ফিরে পায়, পল্টু রে বলে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। একটার পর একটা রেলগাড়ি আসে, যায়, সিটি বাজায়, পল্টুর মার চিৎকারকে লোকে আরেকটা রেলগাড়ির হুইসেল ভেবে অগ্রাহ্য করে। রেলগাড়ির কামরায় তোলা হয় তাদের, অতঃপর। সেখানে, রেলগাড়ি ছাড়ার আগেই, তাদের রুটি খেতে দেওয়া হয়, পেঁচানো রুটি। সেই রুটির ভেতরে আদৌ কিছু ছিল কি না, তা খেয়াল করার মতো অবস্থা এই কাফেলার কারও ছিল না। অজানা গন্তব্যের অনিশ্চয়তা তাদের তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রেলগাড়ি চলতে থাকলে দুলুনি অনুভূত হয়, মালগাড়ির মেঝেতে তারা সবাই একটা মোটা ত্রিপলের ওপরে বসা, তাদের সঙ্গে তিনজন পুলিশ সদস্য, তারা উর্দি পরা, তাদের কাঁধে রাইফেল, তারা বসার জন্য তিনটা বাক্স পেয়ে যায়। জানালাহীন কামরাটার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলে পুরোটা অন্ধকার হয়ে যায়, তখন মাথার ওপরে একটা ছোট্ট বাতি জ্বলে ওঠে, আর কাফেলাটা আশ্বস্ত বোধ করে শীত আর তাদের লাগছে না তেমন। ট্রেনের দুলুনিতে শিগগিরই তারা ঘুমিয়ে পড়ে। রেলগাড়ি চলতে থাকে, এটা তারা বুঝতে পারে, কিন্তু কোথা থেকে কোথায় তারা যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারে না। এর মধ্যে বাচ্চারা কামরার মধ্যেই জল বিয়োগ করে। এর মধ্যে কোনো গাড়ি জংশন স্টেশনে দাঁড়ালে, ক্রসিংয়ের জন্য বা পানি নেওয়ার জন্য কোথাও অপেক্ষা করলে, এই বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয় স্টেশনের শৌচাগারে। কোথাও কোথাও পুলিশ বদল হয়। মাঝে একবার খাবার আসে। পল্টুর মা ঝিমায়, ঘুমায়, মূর্ছা যায়, সজাগ হয়, বিলাপ করে, অশ্রুপাত করে, পাথরের মতো স্তব্ধ থাকে। পল্টুর কথা তার বারবার স্মরণ হয়, পল্টুর বাবার কথা ভেবে তার কান্না আসে। কেবল পল্টুর ওই মূর্তিটা তার চোখে ভাসে, পল্টু তার রঙিন জামা-কাপড় পরে দরগা চত্বরে কাওয়ালদের সারিতে বসে হাত উঁচিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে কাওয়ালিতে টান ধরছে, সে খেয়ালও করতে পারে না যে তাদের কাফেলার কোন মহিলাকে দুটো রুটি বেশি দেওয়ার বিনিময়ে কোন পুলিশ সদস্য তার ঘাড়ে-পিঠে পৃষ্ঠপোষকতার চাপড় মারার সুযোগ নিচ্ছে। সে কেবল পল্টুকে দেখে, পল্টুর কথা ভেবে তার সুখ হয়, শোক হয়, তার সমস্ত জগৎ লুপ্ত হয়, তার দুচোখ জলে ভেসে যায়। তারপর একদিন তাদের রেলগাড়ি থেকে নামানো হয় এক স্টেশনে, যে স্টেশনটার ছাদ লাল রঙের টিনের, যার প্লাটফরমের সিমেন্ট এবড়োথেবড়ো, যার ছাদের বড় বড় লোহার কড়িবর্গা থেকে ঝোলানো বিদ্যুতের বাতি সান্ধ্য অন্ধকার তাড়াতে পারে না, ফলে পথ চলতে গিয়ে কাফেলাটির কারও পা ঘুমন্ত কুকুরের গায়ের ওপরে পড়ে। তাদের লাইন করেই স্টেশনের বাইরে আনা হয়, সারিবদ্ধভাবেই একে একে একটা লরিতে ওঠে তারা। এক অন্ধকার ভোরে তাদের তোলা হয়েছিল ট্রেনে। এক অন্ধকার সন্ধ্যায় তারা খোলা আকাশের নিচে আসে, কিন্তু কুয়াশাঘেরা চারদিকে তাদের নজর বেশিদূর প্রসারিত হয় না। তাদের ফের লরিতে তোলা হয়। লরি চলতে থাকে। লরি এসে নলচেপাড়া সীমান্ত ফাঁড়ির সামনে থামে।

তাদের লরি থেকে নামানো হলে তারা সড়কের পার্শ্ববর্তী দোকানে টেলিভিশনের সামনে দেখতে পায় চাদরে মোড়া মানুষের ভিড়। সেই মানুষগুলোর চাদরে পড়ে টেলিভিশনের পর্দার আলো, একবার সে আলো বাড়ে, আরেকবার কমে।

রসিকলাল নলচেপাড়া সীমান্ত ফাঁড়ির লঙ্গরখানার হেড বাবুর্চি। তার গোঁফজোড়া দেখার মতো, নিচ দিকে ঝোলানো, কাঠবিড়ালির লেজের মতো, তার ভুঁড়িটা একটু বেঢপ রকমের বড়। তার ওপর দায়িত্ব এই লোকগুলোর খাওয়া-দাওয়ার। এদের সবাইকে ফাঁড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ এদের বুঝিয়ে দিয়েছে সীমান্তরক্ষীদের কাছে। রক্ষীদের কমান্ডার একটা কাগজে সই করে সব শিকার বুঝে পেয়েছে মর্মে প্রাপ্তি স্বীকার করেছে। এই মানুষগুলোকে সীমান্তরক্ষা ফাঁড়ির বারান্দায় তোলা হয়েছে। এদের থাকতে দেওয়ার মতো কোনো ঘর নাই ফাঁড়িতে। কাজেই বারান্দাই এদের আশ্রয়। রসিকলাল টর্চ মেরে মাথা গোনে, মেয়েদের মুখশ্রী পরিমাপ করে, শিশুদের দেখে মায়া বোধ করে। কিন্তু পল্টুর মাকে দেখে তার শরীরের ভেতরটায় বিচিত্র ধরনের কী যেন একটা অনুভূতি হয়। তার টর্চলাইটের আলো মুখ থেকে বুক হয়ে পেটে নামতেই রসিকলাল যেন সাপের কামড় খায়। তার নিজের বউটাও পোয়াতি, বহু সাধ্যসাধনার পর কৃষ্ণা গর্ভ পেয়েছে, মাদুলি কবচ কম তাকে ঝোলাতে হয়নি, ত্রিফলা ভেজানো জল রোজ সকালে, তারপর ছোলার অঙ্কুর, কত কি খাওয়ানো হয়েছে কৃষ্ণাকে। সে নিজেও রোজ সকালবেলা মধু খেয়েছে দুই চা-চামচ। তারপর গত পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়ে সে কৃষ্ণার গর্ভসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে মায়ের দয়ায়। এখন কৃষ্ণাকে বাড়িতে রাখা হয়েছে খুব সাবধানে, যেন কিছুতেই কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। তার নিজের মা-ই পুত্রবধূকে যত্ন করছেন, কারণ রসিকলাল তার বংশের একমাত্র বাতি, আর তার যদি সন্তানাদি না হয়, বংশ যে লোপ পেয়ে যাবে। কৃষ্ণাকে মা এমনভাবে রাখেন, যেন তার গায়ে ফুলের আঁচড়টাও না লাগে, আর কুবাতাস থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য তার কোমরে মাদুলি বাঁধা আছে চব্বিশ ঘণ্টা। শাশুড়িরা সাধারণত পুত্রবধূদের দেখতে পারে না, তবুও মা কত যত্ন করছেন কৃষ্ণার, কারণ অন্য কিছু না হলেও বংশের বাতি তো কৃষ্ণারই গর্ভে। আর দেখ, এখানে একটা আসন্ন সন্তানসম্ভবা, লরিতে করে কেমন দিব্যি এসে বসে আছে এই ভরশীতের রাতে নলচেপাড়ার সীমান্ত ফাঁড়ির হিমশীতল বারান্দায়, যেখানে উত্তুরে হাওয়া বয়ে নিয়ে আসছে হাড়কাঁপানো শীত। কী খেয়েছে এই মা সারা দিন? পরনে তো একটা শক্তপোক্ত জামাও নেই। একটা ঢোলা নীল রঙের কামিজ, একটা ঢোলা খয়েরি সালোয়ার, গায়ে শুধু একটা আব্রু রক্ষার মতো লাল চাদর। পা দুটো সামনে ছড়িয়ে মহিলা বসে আছে কেমন করে!

রসিকলাল বলে, এরা করেছে কী! এই রকম একটা গর্ভবতীকে কেউ ধরে-পাকড়ে আনে? এই তোমার স্বামী আছে তোমার সাথে? মহিলা কোনো জবাব দেয় না। টর্চলাইটের আলোয় তাকে বনের ভীতা হরিণীর মতো দেখায়।

রুটি আর ছোলার ডালই বরাদ্দ। ওই পোয়াতির জন্য ছটাক খানিক দুধ জোগাড় করতে পারলে ভালো হতো না?

সবার হাতে শাল পাতার ঠোঙায় খাবার তুলে দিতে দিতে, বালতি থেকে ঘটিতে করে সবার মুখে জল ঢেলে দিতে দিতে রসিকলাল গল্প-গুজব করে। রাজধানী থেকে এদের ধরে আনা হয়েছে। পোয়াতির নাম পল্টুর মা। পল্টুর বাবা কিংবা পল্টু সঙ্গে আসেনি, কেবল পল্টুর মাকেই ধরে আনা হয়েছে। বস্তির পড়শিনী মুখ খোলে।

পল্টুর মার কানে সেই গল্প যায় কি যায় না, বোঝা যায় না। সে খাবারের ঠোঙা হাতে নিশ্চুপ নিষ্ক্রিয় বসে থাকে।

রসিকলাল বাবুর্চি বলে, মাজি, খানা খা লিয়ে প্লিজ। আপনার জন্য না হোক, আপনার পেটের বাচ্চার জন্য তো খানা খেয়ে নেওয়া জরুর হ্যায়।

পল্টুর মা খাবার মুখে দেয়, কিন্তু চিবোয় না, পল্টুর মার চোখ দিয়ে জল গড়ায় নাকি! বারান্দার আলো, উঠোনের সার্চলাইট কি পল্টুর মার চোখের জলবিন্দুকে দৃশ্যমান করে তোলে? পতঙ্গ ওড়ে

www.amarboi.com

পুলিশের সঙ্গে পা মেলাতে কষ্ট হয় পল্টুর মার

লাইট ঘিরে, কুয়াশা ঢেকে রাখে অদূরবর্তী দৃশ্যলোক, রসিকলালের চোখে পোকা পড়ে। সে একটা ঘটিতে করে জল ঢেলে দেয় পল্টুর মার মুখে। পল্টুর মা আঁজলা ভরে জলপান করে, তার আঙুলের ফাঁক গলে খানিকটা জল মাটিতে গড়ায়।

পরিমল মজুমদার ফাঁড়িতে উঁকি দেয়, এরা কারা? স্থানীয় সাংবাদিককে দেখে ফাঁড়ি-কমান্ডার গোঁফ ধরে টানতে থাকে, এই আপদটা এসে জুটল কোত্থেকে। অপারেশন পুশব্যাকের কথা গোপন রাখার অর্ডার আছে। তা না হলে এই গুরুত্বহীন সীমান্ত ফাঁড়ি নলচেপাড়ায় কেন আনা হবে এই নারী-পুরুষদের। স্থলবন্দরগুলোর যেকোনো একটা দিয়েই তো কুড়িজনকে দিব্যি পার করে দেওয়া যেত। সরকার বাহাদুর চায় না যে কোনো রকমের লেখালেখি হোক।

এর আগের বার এই পুশব্যাক পুশইন পুশ-আউট নিয়ে অনেক পানি ঘোলা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিবৃতি দিয়েছে, আর যাই করা হোক, মানুষকে দুই পারের রাজনীতির বলি করা যাবে না। কোনো পক্ষই এদের নিতে চায় না, জোর করে ধরে এই পার থেকে ওই পারে, ওই পার থেকে এই পারে ঠেলে দেওয়া হয় এই আদমিদের। এরা কি মানুষ নয়? এদের কি মানবাধিকার নাই? এদের কি অধিকার নাই বিচার পাওয়ার? এদের কি অধিকার নাই আত্মপক্ষ সমর্থন করার? এদের সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কোন আইনের বলে? মানবতা কি কেঁদে উঠছে না? মানবাধিকার কি লঙ্ঘিত হচ্ছে না?

পরিমল মজুমদার বলে, ক্যাপ্টেন, এনি নিউজ হ্যায়?

নেহি। কুছ নিউজ নেহি হ্যায়।

এই আদমিদের ধরে এনেছ কেন?

আমার ঠিক জানা নাই। আমি ধরেও আনিনি। এরা এসেছে। আমাকে বলা হয়েছে এরা রাতে এখানে থাকবে। এদের আশ্রয় দাও। আমি দিচ্ছি। খানা দিতে বলেছে, রসিকলাল গরম গরম খানা দিয়েছে।

তারপর কাল সকালে এরা কই যাবে?

আমার জানা নাই মজুমদার সাব। তবে একটা কথা বলি। কোনো কিছু রিপোর্ট করবেন না। আপনি কোনো কিছু দেখেননি।

আমি কি রিপোর্ট করব না করব, সেটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন। আমি তো রিপোর্টার, নাকি আপনি? আপনার কাজ আপনি করছেন, করুন। আমার কাজ আমাকে করতে দিন।

সেটাই আপনাকে করতে দিচ্ছি। আপনি এই ফাঁড়ির ভেতরে ঢোকেননি, আর আপনার সাথে আমার কোনো কথাও হয়নি। বুঝলেন।

না, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আপনার সাথে আমার কোনো কথা হয়নি। আমি কিছু জানি না। ডোন্ট আস্‌ক মি এনিথিং। আর এই ব্যাপার নিয়ে আপনাকে কোনো কিছু না লেখার জন্য অনুরোধ করি।

কিছু না লিখলে আমার চাকরি যে থাকে না কমান্ডার সাব।

তা হলে ওই কমলা নিয়ে লিখুন। ডালা ডালা কমলা বর্ডারের ওপারে চলে যাচ্ছে। তার বদলে আসছে শীতের কাপড়। মোটা জ্যাকেট। সেটা নিয়ে লিখুন।

আপনার চৌকি এলাকা দিয়ে তো কমলা আর শীতবস্ত্র বিনিময় হচ্ছে না? না কি বলেন?

আমার চৌকি দিয়ে কেন হবে? রাস্তাঘাট তো এদিকটায় ভালো না। এই রুট তো চালানের জন্য ইউজ হয় না, সেটা আপনি ভালো জানেন।

তা হলে আপনি আমাকে মিসলিড করার চেষ্টা কেন করছেন? মজুমদার সাব, নিন। সিগারেট খান। এটা ভালো সিগারেট। বিদেশি।

থ্যাংক ইউ। আগুন হবে আপনার কাছে?

কমান্ডার আগুন জ্বালায়। পরিমল মজুমদারের গালে দাড়ি, মোচটাও অনাবশ্যক বড়, কমান্ডার দেশলাইয়ের কাঠি মজুমদারের ঠোঁটে ধরা সিগারেট বরাবর এগিয়ে নিয়ে ভাবে, মজুমদারের মুখাগ্নি না হয়ে যায়। এই বুঝি দাড়িতে কিংবা গোঁফে আগুন লেগে যায়। দেশলাইয়ের শিখায় পরিমল মজুমদারের দাড়ির নিচে ব্রণ অথবা বসন্তের দাগ দেখা যায়।

পরিমল সিগারেটের প্যাকেটটা কমান্ডারের হাতে ফেরত দিতে গেলে কমান্ডার বলে, কী করছেন। প্যাকেটটা আবার ফেরত দিচ্ছেন কেন? ওটা রেখে দিন। টেস্টটা পছন্দ হয়নি নাকি?

দারুণ। কুয়াশার গায়ে ধোঁয়া ছেড়ে পরিমল বলে।

আকাশের গায়ে প্রায় গোলাকৃতির একটা চাঁদ। কুয়াশার কারণে মনে হচ্ছে সেটা আকাশে নয়, কুয়াশার গায়েই লটকে আছে। পরিমল চাঁদের গায়ে ধোঁয়া উগরে দেয়।

মজুমদার বলে, যাই, বউটার আবার বাতের ব্যথা। একটু আর্নিকা সেবন করলে কমে। ঘটনা কিছু ঘটে গেলে জানাবেন। একটা-দুটো এক্সক্লুসিভ খবর দিতে না পারলে তো চাকরি থাকে না। এমন একটা এলাকায় থাকি, কোনো খবরই এখানে জন্মায় না।

মজুমদার বিদায় নিলে কমান্ডার নিজের ডেরায় ফিরে যায়। ক্যাম্পখাটে শুয়ে ভাবে, এই নারীবঞ্চিত রক্ষীদের মাঝে কয়েকজন নারী ওই অরক্ষিত বারান্দায় শুয়ে আছে, কোনো ডিসিপ্লিন ব্রেকের ঘটনা না আবার ঘটে।

সকালবেলা কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। রোদ ওঠে। রসিকলাল তার লঙ্গরখানায় রুটি সেঁকে। তাকে সহযোগিতা করে সিপাহি অমর। অমর আটা ছানে, রুটি বেলে। প্রথম দুটো রুটি আলুর দম তালপাতার ঠোঙায় ভরে রসিকলাল বারান্দায় ছুটে যায়। পল্টুর মায়ের হাতে সে রুটিদুটো দিতে চায়। আজ সকালে ওদের ব্রেকফাস্ট দেওয়ার দরকার নাই, কমান্ডার বলেছিল। খুব ভোরবেলা ওদের নিয়ে বের হতে হবে। এতগুলো মরদ মাগি বাচ্চাকে ঘুম থেকে তুলে বের করতে করতে সিপাহিদের দেরি হয়ে যায়। ওরা সব শৌচাগারে যেতে থাকে একজন একজন

www.amarboi.com

করে। প্রত্যেককে চোখে চোখে রাখতে হয়, যেন কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। রসিকলাল রুটি নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে, কেউ নাই। শুধু মানুষের শরীরের একটা বোঁটকা গন্ধ বারান্দাজুড়ে। রসিকলাল রুটির ঠোঙা হাতে ফিরে আসে। কুয়াশা ভেদ করে সদ্য উদিত সূর্য তার পেছনে উঁকি দেয়। তার সামনে তার লম্বা ছায়া। সেই ছায়ায় শাল পাতার ঠোঙা দেখা যায়।

ফুঁ। রসিকলাল মুখ দিয়ে শ্বাস বের করলে রোদের মধ্যে ধোঁয়া ফুটে ওঠে। তার ছায়ার মধ্যেও সেই ধোঁয়া দেখা যায়।

সিপাহিরা কুড়িজন আদমির দলটাকে সীমান্তের একটা অনুল্লেখ্য জায়গায় নিয়ে যায়। জায়গাটা ফাঁকা। এ পারে ধানখেত। ধান কাটা হয়ে গেছে। ধানের গোড়া রয়ে গেছে খেতে। ওই পারে সরষেখেত। তীব্র হলুদ সকালের রোদে তা জ্বলজ্বল করছে। মধ্যখানে নো ম্যান'স ল্যান্ড। মাঝেমধ্যে সীমানার খুঁটি। নো ম্যান'স ল্যান্ডে কোথাও হাঁটুসমান ঘাস। কোথাও জঙ্গল। সবুজ সেই সব গুল্মলতার গায়ে নানা রঙের ফুল। ফুলে প্রজাপতি উড়ছে। এই সীমান্তে নো-ম্যান'স ল্যান্ডটা পতিত পড়ে আছে, কারণ জায়গাটায় নুড়িপাথর বেশি। চাষ উপযোগী নয়। নুড়ির ফাঁকে ফাঁকেই লতাগুল্ম ঘাস গজিয়েছে। কোথাও কেবল দূর্বাঘাস। একটা বেজি ওই নির্জন এলাকায় হঠাৎ মানুষের আগমনের হেতু ঘাড় উঁচিয়ে অনুসন্ধান করে। ঢেঁকিশাক। ওই দূরে শটিবন। ওই পারে কিছু জায়গা নিচু। একটা নালার মতো আছে ওই পারে। বর্ষাকালে সেখানে পানি জমে। এখন সেটা শুকনো।

সিপাহিরা এই কাফেলার কোমরের দড়ি খুলে দেয়। তারপর তাদের বলে, যাও, তোমরা মুক্ত, সোজা ওই পারে চলে যাও। জলাটা পার হলেই একটা রাস্তা পাবে। পায়ে চলা রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে সোজা সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটতে থাকবে। কিছুক্ষণ হাঁটলেই পেয়ে যাবে উঁচু রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে গেলেই পাবে হলদিবাড়ির হাট। সেখান থেকে রিকশাভ্যান, টেম্পো, যা খুশি একটা কিছু ধরে তোমরা চলে যেতে পারবে যেখানে খুশি। তোমাদের কেউ ওই পারে আটকাবে না।

তাদের পা চলে না। সিপাহিরা তখন বন্দুক তোলে। যাও।

ওরা সীমানা খুঁটি পেরিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটতে থাকে।

সবার পেছনে হাঁটে পল্টুর মা। তার চোখে রোদ লাগছে। কিন্তু রোদের ওমটা তাকে তেজ দিচ্ছে।

ওই পারে কেউ ছিল না। কিন্তু নালার গভীরে কারা যেন অবস্থান নিয়ে ছিল। তাদের মাথার ক্যাপগুলো প্রথমে নজরে আসে। অচিরেই তাদের পুরো দেহ দেখা যায়। তাদের হাতেও বন্দুক।

হলদিবাড়ির সীমানা প্রহরীরা আগে থেকেই খবর পেয়েছিল, আজ পুশইন হতে পারে। তারাও দুরবিন হাতে নালার ভেতরে অবস্থান নিয়ে বসে থাকে। সকাল বেলা একপাল মানুষকে তারা উত্তরের দিকে সরতে দেখে। নিজেরাও নালা বেয়ে উত্তরের দিকে সরে যায়। ওই পারের রক্ষীরা ওই কাফেলাটাকে নো-ম্যান'স ল্যান্ড দিয়ে এপারের দিকে ঠেলে দিলে তারা মাথা বের করে।

তারা তাদের সীমানার ভেতরে বুক উঁচিয়ে অবস্থান নেয়।

কাউকেই তারা ওই হলদিপাড়ায় পা রাখতে দেবে না।

পল্টুর মা সবার পরে। সবার আগে বাচ্চা দুজন। তারপর তাদের বাবা-মা। পুরো পরিবারটিকেই তুলে আনা গেছে। তার পেছনে আরেকটা শিশু। বছর চারেকের মায়া। সে তার মায়ের কোলে ওঠার জন্য কাঁদছে। তার মা অসুস্থ বোধ করছে। মা তার মেয়ের কান মলে দিয়ে বলে, হাঁট। কদম ফেল।

হলদিবাড়ির প্রহরীরা হ্যান্ড মাইকে চিৎকার করে ওঠে: আপনারা অবৈধভাবে বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করিতেছেন। আর আগানোর চেষ্টা করিবেন না। আর এক পা সামনে আগাইলে আমরা গুলি করিতে বাধ্য হইব।

কাফেলাটা একটু ইতস্তত করে। পেছনের বড়রা থমকে দাঁড়ায়। সামনের বাচ্চা দুটো হাঁটতেই থাকে।

ওই লিটন, থাম না কেন। মানা করছে না?

তারা কী করবে বুঝতে পারে না। তারা দলা পাকায়। নিজেদের মধ্যে কথা বলে। তারা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। এবার সূর্য তাদের পেছনে চলে আসে। সামনে ছায়া পড়ে। তারা এবার নলচেপাড়ার দিকে রওনা দেয়।

দুরবিন লাগিয়ে নলচেপাড়ার সীমান্তরক্ষীরাও সটান দাঁড়িয়ে আছে। এটা ওদের কল্পনাতেও ছিল না যে এই সকালবেলার অভিযানের খবর হলদিবাড়ির প্রহরী ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে। এভাবে ওই পারের প্রহরীরা এই কাফেলার পথরোধ করে দাঁড়াবে, এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এই মানুষগুলোকে ফিরতে দেওয়া যাবে না কিছুতেই। এই রকমই আদেশ। একটা মানুষকে এই সীমানা পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য প্রায় ১১ হাজার রুপি করে খরচ হয়ে গেছে। এদের কিছুতেই ফিরতে দেওয়া যায় না।

নো-ম্যান'স ল্যান্ড ধরে তারা আবার নলচেপাড়ার দিকে এগিয়ে যায়। তখন নলচেপাড়ার রক্ষীরা হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা দেয়: এই পারে আসার চেষ্টা মাত করো। আর এক কদম আগে বাড়ো তো গুলি হবে।

পল্টুর মা কী করবে বুঝতে পারে না। দলের পেছনে ছিল সে। এবার সে সবার সামনে। এই মোটা পেট নিয়ে, দুই দিনের বিরামহীন ভ্রমণ, ধকল, বিচ্ছেদের ভার সে আর সইতে পারছে না। পল্টুর মা মাটিতে বসে পড়ে।

তখন তার কাছে এসে দলের অন্য সবাইও মাটিতে বসে পড়ে। এই জায়গাটায় সবুজ দূর্বাঘাস বিছানো। মাটি তাদের যেন আপন বুকে টেনে নেয়। তাদের আরাম বোধ হয়।

কতক্ষণ তারা বসে থাকবে সেখানে! মুঝে ভুক লাগ রাহে হ্যায়। লিটন কাঁদে।

তাদের ছায়া ছোট হতে থাকে। ছায়া সরে যায়। পুবে কিংবা পশ্চিমে সঙ্গিন হাতে সান্ত্রীরা প্রহরারত। তারা নড়ে না। রোদে তাদের বন্দুকের নল চকচক করে। তাদের ছায়া ছোট হতে হতে পায়ের নিচে চলে আসে। তাদের খিদে পায়। তারা তেষ্টা বোধ করে। তারা পরামর্শ করে। কাফেলার সবচেয়ে প্রবীণ লোক, লস্কর মৃধা, বয়স ৪৫, দাঁত হলুদ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গলায় লাল মাফলার, গায়ে সবুজ সোয়েটার, পরনে লুঙ্গি, বলে, এখানে থেকে আমরা কী করব। এপার বা ওপার, কোনো দিকে তো আমাদের যেতে হবে। চলো, আমরা ফির হাঁটি।

আমরা কোন দিকে হাঁটব? একজন প্রশ্ন করে।

চলো, আমরা পশ্চিম দিকে হাঁটি।

তারা নলচেপাড়ার দিকে মুখ করে হাঁটে।

নলচেপাড়ার রক্ষীরা নড়ে ওঠে। হট যাও। দূর হও। এদিকে আসার চেষ্টা কোরো না। তাদের হ্যান্ডমাইকে ধাতব আওয়াজ হয়।

কিন্তু এই আদমসন্তানেরা অনন্যোপায়। তাদের কাছে পানি নাই, খাবার নাই, তাদের মাথার ওপরে ছাদ নাই, তারা এই বিরান ভূমিতে কী করে টিকবে? কতক্ষণ টিকবে।

তারা যেন মরিয়া। তারা জোরে হাঁটে। লস্কর মৃধা তাদের বলে, বুকে হিম্মত রাখো। জোরে হাঁটো। কেউ পিছপা হবে না। ওরা আমাদের মারতে পারবে না। গুলি করতে পারবে না। মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকলে আগেই মেরে ফেলত। আর এখন এই বর্ডারে এনে আমাদের মারা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মারলে এটা দুনিয়াজোড়া খবর হয়ে যাবে। চলো। আমরা ফিরে যাব।

পল্টুর মা এবার মুখ খোলে। বলে, হ্যাঁ, আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমাকে অবশ্যই ফিরতে হবে। আমার পল্টু রুটি না খেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পল্টুর বাবা আমাকে না পেয়ে পাগল হয়ে গেছে। আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

তারা মরিয়া ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় পশ্চিম দিকে। ফণিমনসার ডালে একটা গিরগিটি তাদের দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে আর গলা ফোলায় আর জিভ প্রসারিত করে।

না, তারা সীমানা খুঁটি পার হতে পারে না। নলচেপাড়ার রক্ষীরা তাদের ধাক্কা মারে। লস্কর মাটিতে পড়ে যায়। তখন পুরো কাফেলাটি লস্করকে ধরে মাটিতে বসে পড়ে।

তোমরা এখানে থাকবে না। যাও। তোমরা হলদিবাড়িতে চলে যাও। কনুই পর্যন্ত উঠে আসা একটা লাল পিঁপড়া পিষে মারতে মারতে রক্ষীদের নেতা হুকুম দেয়।

তারা ওঠে না। তারা বলে, এ কী করছ তোমরা আমাদের সাথে? তোমরা তোমাদের পারে আমাদের থাকতে দেবে না। আবার ওরা ওদের পারে আমাদের ঢুকতে দেবে না। তাহলে আমরা কী করব। আমরা তো যেখানে ছিলাম ভালোই ছিলাম। কেন তোমরা আমাদের সেখান থেকে তুলে আনতে গেলে?

বাচ্চাদের মা বলে, ভাই, আমার ছেলেটার খিদা পেয়েছে। আমার মেয়েটা খিদায় কাঁদছে। তোমাদের ঘরেও তো এই বয়সী ছেলেমেয়ে আছে। তাদের কথা মনে করো। আমাদের ভেতরে

www.amarboi.com

যেতে দাও। আমাদের বাচ্চাগুলোকে খাবার আর পানি এনে দাও।

তাদের বুঝি দয়া হয়। তারা তাদের পিঠের বোঝা থেকে পানির ফ্লাস্ক বের করে বাচ্চা মেয়েটাকে ডাকে। লাড়কি, ই ধার আও। মেয়েটি, মায়া, রক্ষীটির কাছে আসে, হাঁ করে আকাশে তাকায়। রক্ষী তার মুখে জল ঢেলে দেয়। তখন সবাই আমাদের পিয়াস পেয়েছে বলে তার ফ্লাস্কের নিচে একযোগে মুখ লাগাতে চায়। উনিশটি মুখ একযোগে একটা ফ্লাস্কের নিচে নিজেদের হাঁ মুখ পেতে দেয়।

রসিকলাল ঠিকই খবর পায়। ওই নারী পুরুষ শিশুরা খোলা আকাশের নিচে অন্নহীন জলহীন সময় পার করছে। পরিমল মজুমদারও খবরের লোভে বাইসাইকেলে চেপে চলে আসে ফাঁড়িতে। হোমিওপ্যাথির দোকান আরোগ্য নিকেতনের সামনে সে সাইকেল রাখে। বাইরে আজ রোদ উঠেছে, আরোগ্য নিকেতনের ভেতরটা তার রোদধাঁধানো চোখে অন্ধকার বলে মনে হয়। ভেতরে ডাক্তার বাসুদেব ধর আছে কি না, সে ঠাওর করতে পারে না।

বাসুদেবের গলার স্বর তার কানে আসে, বুঝিলেন মজুমদার বাবু, এই চর্মচক্ষে কালে কালে কত কিছু দেখা হলো। এই বর্ডারে কত কী দেখলাম। এই তো মনে হয় সেদিনও হামরা বিদেশি কাপড় কিনিবার বাবদ হলদিবাড়ির হাটে চলিয়া গেছি। আর ওমরাও পাতার বিড়ির লাগিয়া এ পাড়ে আসছে। ফির গোলাগুলি হইছে, সেইটাও দেখছি। কিন্তুক তাই বলিয়া মানুষ ধরিয়া জোর করিয়া এই পারত থাকিয়া ওই পার, ওই পার থাকিয়া এই পার, এইটা তো দেখোম নাই।

পরিমল মজুমদার বলে, ডাক্তার বাবু আছেন নাকি। রোদ থাকিয়া আসছোম তো, তাই থিত পাঁও নাই। তা তোমরা যা কইছেন বাহে কথা ঠিক। কিন্তুক এই ঘটনা অন্য বর্ডারত ম্যালা হইছে। এইটারে কয় পুশব্যাক। ইল্লিগালগুলানক ধরিয়া ফেরত পাঠেয়া দেওয়া কয় বাহে।

বাসুদেব বলে, তা আপনেরা বাহে সাংবাদিক মানুষ। কত কিছু জানেন। মুই তো খালি জানোম একনা হোমিওপ্যাথি। কিন্তুক মোক কিন্তু ভালো ঠেকে না। একটা সাগরের মধ্যে এক বালতি পানি তুলিলেই কি, ঢালিলেই কি? শুনিলাম নাকি কুড়ি জনক ধরিয়া আনছে। কুড়িটা মানুষক কি হামরাও খিলাবার পারি না, ওমরাও পারে না?

পরিমল মজুমদার ততক্ষণে আরোগ্য নিকেতনের ভেতরেই ঢুকে গেছে। বাঁশের বেড়ার ঘর, ওপরে ঢেউটিনের ছাপরা, তার নিচে বাঁশের ছাদ, একটা টেবিল আর চেয়ার। চেয়ারে ডাক্তার বাবু বসা। অপরদিকে একটা বেঞ্চ, রোগীর জন্য। রোগী দরকার হলে এই বেঞ্চে শুয়েও পড়তে পারে। একদিকে কাঠের আলমারি। তাতে সারি সারি ওষুধের শিশি। মাটির মেঝে। কেঁচো মাটি তুলে হোমিওপ্যাথির গুলির মতো ছোট ছোট দানা তৈরি করে রেখেছে সেই মেঝের এখানে-ওখানে। টেবিলের চার পায়ের নিচে ইট পাতা। বেঞ্চের নিচেও। চেয়ারের নিচে ইট নাই। তাই চেয়ারের পায়া চারটা ক্ষয়ে গেছে। ঘরের ভেতরে ঢুকে মজুমদারের শরীরটা একটুখানি আরাম পায়। বাইরে রোদটা তার শরীরে যেন বিঁধছিল।

'তা কি আর না পারে বাহে ডাক্তারবাবু। পারে। কিন্তুক ইয়ারে নাম তো ডিপ্লোম্যাসি। ইয়ারে কয় পলিটিক্স। খিলাইতে পারে, কিন্তু খিলাইবে না। মারিবারও পারে। কিন্তু মারিবে না। গুলি করিবে না।'

'পেপারত লেখা বাইরাইল কিছু! আজকার পেপারত কিছু লেখছেন?'

'না। লেখি নাই। কাইলকা বেশি রাইতের ঘটনা। আইজকা দেখি সারা দিন কী হয়। তারপরে না লেখা যাইবে। তয় কমান্ডার বাবু তো মানা করে। কয় না লেখেন বাহে।'

'আর কিছু কইছে। যেইবার বর্ডারত গোলাগুলি হইল, তার আগত কিন্তুক হামাক কয়া দিছিল, মানুষজন দূরে সরি থাকেন। হামরা ম্যালা দূর চলিয়া গেছলাম। এইবার কমান্ডার কয় কিছু? গণ্ডগোল পাকেয়া ফির গোলাগুলি না শুরু করি দেয়। দোকানটা একেরে ফাঁড়ির বগলত। মোর অসুবিধা হইছে এইটা।'

'না। সেই কথা তো কিছু কয় নাই। গোলাগুলি হওয়ার চান্স নাই। কিন্তুক মনে হয় প্লান ফেইল করছে। ভোরবেলা কুয়াশা থাকতে থাকতে মানুষগুলানক বর্ডার পার করিয়া দিবার প্লান আছিল। সেইটা মনে হয় করিবার পারে নাই।'

হট যাও। দূর হও

'খারাপ কিছু আন্দাজ করিবার পারিলে একনা হুঁশিয়ার করি দেমেন বাহে। সাবধানের মাইর নাই।'

'তা করা যাইবে ডাক্তার বাবু। যাও, দেখিয়া আইসোম কোটেকোনা কী হয়!'

'আচ্ছা যান। বউমার বাতের বেদনা একটু কমিল?'

'কেবল এক দাগ ওষুধ পড়ছে। কমিবে।' পরিমল মজুমদার আরোগ্য নিকেতনের বাইরে আসে, এরই মধ্যে তার শীত লাগতে শুরু করে দিয়েছিল।

লস্কর মৃধা বলে, সবার খিদে পেয়েছে। মহিলারা নড়তে পারছে না। বাচ্চাগুলান মরো মরো। তোমরা না সীমান্তরক্ষী। তোমাদের কাজ না রক্ষা করা? কী রক্ষা করো তোমরা? এই খুঁটিগুলোকে? মানুষ মেরে তোমরা খুঁটি বাঁচাও?

একজন রক্ষী বলে, তোমাদের জন্য ওই পারে দুপুরের খাবার রেডি করে রেখেছে। তোমরা ওই পারে যাও।

সেই দুপুরবেলা, ওই রক্ষীর এই কথাটা, তাদের মরীচিকার মতো প্রলুব্ধ করে। বাচ্চারা আর নারীরা বলে ওঠে, চলো, আমরা তা

www.amarboi.com

হলে ওই পারেই যাই।

কাফেলাটা আবার ওঠে। শুধু একজন উঠতে চায় না। পল্টুর মা। ওই পারে তার কে আছে? এই পারে আছে তার পল্টু। তার পল্টুর বাবা। মায়ার মা এসে হাত ধরে, বহিন, চলো। এত কষ্ট করেছ। আরেকটু করো। চলো, ওই পারে যাই। ঢুকতে না পারি, যদি একটু খানা পাই। তারা হেঁটে হেঁটে ৩০০ গজ এলাকাটা পার হতে চায়। কিন্তু এর চেয়ে দীর্ঘ পথ যেন তারা কোনো দিনও পাড়ি দেয়নি, তাদের এই রকম বোধ হয়। লতাগুল্ম পেরিয়ে, দূর্বাঢাকা জমিন মাড়িয়ে, তারা হলদিবাড়ির কাছে যেতে না যেতেই ওপারের প্রহরীরা গর্জে ওঠে। খবরদার, এই দিকে আসার চেষ্টা কোরো না। খবরদার।

তখন তারা বলে, তোমরা নাকি আমাদের জন্য খানার ব্যবস্থা করেছ। আমরা তাই এসেছি!

খানা? তোমাদের কেন আমরা খানা দিতে যাব? তোমরা যেই পার থেকে এসেছ, সেই পারে যাও। ওরা তোমাদের খানা দেবে।

আমরা আবার ওই পারে যেতে পারব না। আমাদের শক্তি নাই।

না, তোমাদের ওই পারেই যেতে হবে। না গেলে আমরা তোমাদের গুলি করব।

তাই করো। আমরা আর পারি না। সবাই ওখানেই মাটিতে বসে পড়ে।

মহিলারা শাড়ি কাপড় দিয়ে একটা জায়গা ঘের দেয়। সেখানে বসে তারা প্রাকৃতিক কাজ সারে। খানিকটা দূরে, শটিবনের মধ্যে যাওয়ার শক্তিও তাদের নাই।

সূর্য পশ্চিমে হেলে যেতে থাকে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর এই মানুষগুলো একবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। একবার নিশ্চুপ হয়ে যায়। এরা কী করবে বুঝতে পারে না।

আমাদের খানা দাও। তারা চিৎকার করে।

তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেখানে যাও। সেখানে তোমাদের জন্য খাবার আছে।

পরিমল মজুমদার কমান্ডারের সামনে বসা। তারা নলচেপাড়া সীমান্ত রক্ষা ফাঁড়ির আঙিনায়, একটা শিরীষগাছের নিচে, প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে মুখোমুখি বসে আছে। সামনে একটা লাল প্লাস্টিকের টেবিল। তাতে দৈনিক সীমান্ত জনপদের একটা কপি। কমান্ডার উর্দি পরা, মাথায় ক্যাপ, হাতে একটা লাঠি, সেটা সে একবার ডান হাতে, একবার বাম হাতে নিচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, সে বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে। তার গায়ের রং তামাটে, গাল বসে যাওয়া, নাকের নিচে চিকন কিন্তু গাঢ় গোঁফের রেখা, চোখদুটো কোটরাগত। সে একহারা এবং বেশ লম্বা।

শিরীষগাছ থেকে টুপটাপ করে চিকন চিকন পাতা ঝরে টেবিলের ওপরে পড়ছে।

পরিমল মজুমদার বলে, আপনি আমাকে অন দ্য রেকর্ড একটা প্রশ্নের জবাব দেন। আমরা দেখেছি, গত রাতে কুড়িজন মানুষকে এই ফাঁড়িতে রাখা হয়। সকালে তাদের হলদিবাড়ির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এখন হলদিবাড়িওয়ালারাও তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তারা নো-ম্যান'স ল্যান্ডে আটকা পড়ে আছে। মানুষগুলোর খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, পায়খানা পেশাবখানা নাই, এমনকি জল নাই। তারা যদি মারা যায়, তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবে?

কমান্ডার ক্যাপটা খোলে। আবার পরে। চিৎকার করে বলে, এই দুই কাপ চা দিয়ে যাও না এখানে। দো কাপ চায়ে।

একজন সিপাহি দৌড় ধরে লঙ্গরখানা অভিমুখে। কমান্ডারের কথা মানেই হুকুম।

মজুমদার তার রিপোর্টারের নোটবুক বের করে। বুকপকেট থেকে কলম বার করার জন্য সোয়েটারের ভেতরে তাকে হাত ঢোকাতে হয়।

কমান্ডার বলে, ওয়েল, মজুমদার বাবু, আপনাকে আমি অন দ্য রেকর্ড কিছুই বলব না। আপনি আমাকে কোট করে কিছু লিখবেন না। আমি আপনাকে কিছুই বলি নাই।

আচ্ছা ঠিক আছে। অন দি রেকর্ড বলতে হবে না। আমি আপনার সাথে দেখাও করি নাই, কথাও বলি নাই। মানলাম। এখন বলেন, ঘটনা এই রকম কেন ঘটল। এতগুলা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে...

আপনাকে সাচ বলি। কিন্তু আমাকে কোট করবেন না। আমরা ভাবি নাই যে হলদিবাড়ির প্রহরীরা সীমানার ওই অংশটাতেও প্রহরা রাখবে। ওই দিকে তো কোনো রাস্তাঘাট নাই। আর সকালবেলা কুয়াশা থাকার কথা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে ওরা বর্ডার পার হয়ে ওই পারে চলে যাবে। তা হলেই তো আমাদের দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত। আমরা সেইভাবেই প্লান করেছিলাম। কিন্তু আজ সকালে রোদ উঠে যাওয়ায় সমস্যা হয়েছে। আর ওরাও কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে যে আমরা আজ এই অপারেশনটা করতে যাচ্ছি। ওরাও প্রটেকশন নিয়েছে।

এখন কী হবে?

আমি ওপরের সাথে কথা বলছি। আমাদের ওপরে অর্ডার আছে, হাল ছেড়ে দিয়ো না। একবার যখন বের করে দেওয়া গেছে, আর ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে না।

আপনারা এই মানুষগুলোকে আর এই নলচেপাড়াতে ঢুকতে দেবেন না?

না। দেব না।

আর ওরা হলদিবাড়িতে এদের ঢুকতে দেবে না?

এটা ওদের ব্যাপার। আমি কী করে বলব?

চা আসে। মোষের দুধের চা। চায়ের কাপে দুধের সর ভাসছে। কাপ অবশ্য মগের সমান।

পরিমল মজুমদার চায়ে চুমুক দেয় সশব্দে। কমান্ডার চায়ের কাপ হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই সময় রসিকলাল আসে। বলে, স্যার। মানুষগুলো না খেয়ে আছে স্যার। আপনি স্যার অনুমতি দিলে ওদের জন্য কিছু খাবার পাঠাতে পারতাম স্যার।

কমান্ডার আকাশের দিকে নীরবে চেয়ে থাকে। নীরবতা পরিমল মজুমদারের চা পানের সুরুৎ সুরুৎ শব্দকে বড় স্পষ্ট করে তোলে।

স্যার। রসিকলালের কণ্ঠে অনুনয়।

তুমি তোমার কাজে যাও রসিকলাল। আমি তোমাকে জানাব কী করতে হবে।

রসিকলাল নড়ে না। সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। অপরাহ্নের সূর্য নরম হয়ে এসেছে। রোদের রং হলদেটে হতে শুরু করেছে। শিরীষগাছে কয়েকটা গগনচিল এসে বসে আছে। তাদের পালকে শীতের পড়ন্ত দুপুরের রং।

পরিমল মজুমদার বলে, আমি উঠি। একটু স্পটটা ঘুরে আসি। কোনো বিপদ-আপদের আশঙ্কা নাই তো? গোলাগুলি হবে না তো?

কমান্ডার মাথা নাড়ে। না, সে সম্ভাবনা আমাদের দিক থেকে নাই। কিন্তু ইউ নেভার নো। কখন কী ঘটে যায়। আমাদের দিক থেকে প্রস্তুতি আছে। তবে পজিশনওয়াইজ ওরা বেটার পজিশনে আছে। ওই পারে যে নালাটা, সেটা ওদের জন্য ট্রেঞ্চের কাজ করে। ওরা ওটাতে হাইড করে শেল্টার নিতে পারে। আমরা আগে ফায়ার ওপেন করব না, এটা বলতে পারি। আমরা চাই না, এই ঘটনাটা নিয়ে দেশ-বিদেশে লেখালেখি হোক। কাজেই আমরা কোনো রকমের টেনশন ক্রিয়েট হতে দিতে চাই না। আমার ওপরে এই রকমেরই অর্ডার।

পরিমল মজুমদার চেয়ার ছাড়ে। উঠোন পেরিয়ে কাঠের গেটটা ঠেলে খোলে। ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হয়।

উত্তর দিকে পাথারের মধ্যে এই ঘটনা। ওইখানে দুপাশেই কোনো রাস্তাঘাট নাই। এরা জায়গাটা বাছাই করেছিল ভালো। কিন্তু কাজটা ঠিকভাবে করতে পারল না। কেঁচে গেছে।

পরিমল মজুমদারের স্যান্ডেলের তলা ভারী হয়ে যায়। ঘাস বিছানো পথে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। এরই মধ্যে ঘাসে শিশির জমতে শুরু করে দিয়েছে! আশ্চর্য তো। শিশিরভেজা স্যান্ডেলে ধুলো জমছে। মজুমদার পথহীন পথে হাঁটে। উত্তরের দিকে খানিকটা যাওয়ার পরে শিমুলগাছটার তলা থেকে ঘটনাস্থল চোখে পড়ে। মানুষগুলোর রঙিন জামাকাপড়। তারা আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে ফের নলচেপাড়ার দিকেই আসছে।

পরিমল সীমান্ত খুঁটি পর্যন্ত যায়। রক্ষীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। রক্ষীদের হাতে বন্দুক। চোখমুখ ভাবলেশহীন।

৩০০ গজ পেরুতে তাদের মনে হচ্ছে পুরো এক দিন লেগে যাবে। এমনি শ্লথ তাদের চলার গতি। কী করবে বেচারিরা। তাদের শরীরে চলার শক্তি থাকতে হবে তো!

ওরা কাছাকাছি আসতেই হ্যান্ডমাইকে একজন রক্ষী কথা বলে ওঠে: তোমরা ফিরছ কেন। ফেরার চেষ্টা করে লাভ নাই। তোমাদের ওই পারেই যেতে হবে। আমরা তোমাদের আর

www.amarboi.com

সীমানা খুঁটি পার হতে দেব না।

কিন্তু তারা থামে না। তারা গতি মন্থরও করে না। তাদের কোনো ভাবান্তর নাই। তারা হেঁটে হেঁটে একেবারে রক্ষীদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারা বলে, আমরা তো মরেই যাব। আমরা এখানেই মরি।

তারা বসে। তারা শুয়ে পড়ে।

পরিমল মজুমদার ক্যামেরা বের করে। ছবি তোলে।

তখন একজন রক্ষী বলে, ফটো তুলবেন না। সে ছুটে আসে। ক্যামেরা দিন। ছবি তোলা নিষেধ।

আমি তোমার কমান্ডারের সাথে কথা বলব। তোমার সাথে না।

রক্ষী ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে বলে, আমার কাছে ক্যামেরা থাকল। এবার আপনি স্যারের সাথে কথা বলেন।

পরিমল মজুমদার অপমানিত বোধ করে। বলে, তুমি জানো, তোমার কমান্ডারের সাথে আমার কী সম্পর্ক?

স্যার। আপনি আমাকে মাফ করবেন স্যার। তবে আমি ক্যামেরাটা কমান্ডার স্যারকেই জমা দিব। তারপর উনি যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবেন।

পরিমল মজুমদারের পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছে। তার মনে হয় কষে এই সিপাহিটার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু সে নিজের রাগ দমন করে। পরিস্থিতি ভালো না। কর্তব্যরত রক্ষীর গায়ে হাত তোলার পরিণতি ভালো হবে না।

সে সামনের দিকে তাকায়। কতগুলো মানব সন্তান। তারা দেখতে তারই মতো। অথচ কী একটা অবমাননাকর পরিস্থিতিতেই না তারা পড়েছে। লোকগুলোর চোখে হতাশা। অনিশ্চয়তা। ক্লান্তি। মহিলাদের চোখে অসহায়ত্ব। দুঃখ-কষ্ট-শোক। শিশুদের চোখে মুখে শ্রান্তি-ক্ষুধা-শঙ্কা-মুমূর্ষুতা। আর ওই যে মহিলা, পল্টুর মা, তার মোটা পেট নিয়ে সে কীভাবে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। এখন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পেটটা আকাশের দিকে উঁচানো। লোকগুলো বিভিন্ন বয়সী। কারও পরনে লুঙ্গি, কারও পরনে প্যান্ট। বেশির ভাগের পায়েই জুতা-স্যান্ডেল নাই। এই শীতের দিনরাতগুলো তারা কীভাবে কাটাচ্ছে। লুঙ্গি পরিহিত লোকটার উর্ধ্বাঙ্গে সোয়েটার আছে বটে, কিন্তু লোকটার পা খালি। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে যদি একে থাকতে হয়, এর পা জমে বরফ হয়ে যাবে।

পরিমল মজুমদারের চোখ পড়ে বছর চারেক বয়সী মেয়েটির দিকে। সে কেমন ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মজুমদার তাকে হাত উঁচিয়ে ডাকে। ইধার আও।

মেয়েটি কাছে আসে।

তুমহারা নাম কিয়া হ্যায়?

মায়া।

পরিমল মজুমদার কঠিন লোক। আজ সকালেই তিনি তার ১০ বছরের ছেলে পরিতোষের পিঠে একটা বেত ভেঙেছেন। এর কারণ পরিতোষ তাদের থার্মোমিটারটা ভেঙেছে। থার্মোমিটার কোনো দামি জিনিস নয় যে এটা ভাঙলে কাউকে মারতে হবে। কিন্তু ছেলেটা পারদ নিয়ে খেলছিল। পারদ বিষ। এই পারদ যদি তার পেটে যেত, তাহলে সে মরে যেতে পারত। এই ঘটনা দেখার পরে ছেলেকে না মেরে সে থাকতে পারেনি। বদরাগী বলেই তার দুর্নাম আছে। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটি, তার কাজল-বরণ মুখ, কাজল-কালো চোখ, তার নাকফুল, নাকের নিচে সর্দি, তার লাল এলোমেলো চুল, তার নীল ফ্রক, তার খালি পা, আর তার এই নাম, মায়া, কেন যেন তার চোখে জল নিয়ে আসে। তিনি বলেন, কিছু খাইছ?

কিছু খাই নাই।

দুপুরে কী খাইছ?

কিছু খাই নাই।

বিহানে কী খাইছ?

কুছ নেহি।

সারা দিন কী খাইছ?

কিছু না।

সারা দিন কিছু না খায়া আছ?

মেয়েটা মাথা নাড়ে।

কিছু খাইবা? বলে মজুমদার বুঝতে পারে সে ভুল করেছে। তার সঙ্গে কোনো খাবার নাই।

জি, বলে মায়া হাত বাড়িয়ে দেয়।

মজুমদার বলে, আচ্ছা তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।

মজুমদার গলা উঁচিয়ে বলে, আমি যাচ্ছি কমান্ডার সাবের কাছে। আই উইল কমপ্লেইন এগেইনস্ট ইউ। আই উইল রাইট ইন মাই নিউজপেপার। দিস ইজ স্টিল আ ডেমোক্রেসি, আই থিঙ্ক।

সিপাহিটার পরনে উর্দি, মাথায় কাপড়ের ক্যাপ, হাতে উদ্যত সঙ্গিন, সে বলে, আমি আমার চাকরি করছি। আপনি আপনার কাজ করছেন। আমার কাজ হলো কাউকে ফটো তুলতে না দেওয়া। আপনার কাজ হলো কমপ্লেইন করা। আপনি করেন। আপনার কাজ লেখা। আপনি লেখেন। আমি তো হুকুমের বাইরে যেতে পারব না। এখনই হুকুম আসবে, ক্যামেরা দিয়ে দাও। আমি দিয়ে দেব।

মজুমদার কথা বাড়ায় না। একটা মানুষ যখন উর্দি ছাড়া থাকে, তখন সে আর সব উর্দিছাড়া মানুষের মতোই একা, নিঃসঙ্গ, সাধারণ, ব্যথিতহৃদয় একজন মানুষ। কিন্তু যখনই তার গায়ে উর্দি চাপে, যখনই তার হাতে সঙ্গিন ওঠে, তখন সে আর সাধারণ মানুষ থাকে না, সে তখন হয়ে যায় একটা লেফট রাইট করা রোবট, তার কাছে অর্ডার মানে অর্ডার, এই রসায়নটা ঘটে বলেই তারা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ফরোয়ার্ড মার্চ করতে পারে, নইলে তো যেকোনো দেশের যেকোনো সৈন্যদলই সামনে শত্রুবাহিনী দেখলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেত। তা তো তারা করে না। কেবল কমান্ডার রিট্রিট করতে বললেই তারা পেছায়। ওই পেছানোটাও তখন যুদ্ধেরই এক কৌশল মাত্র।

এই সিপাহিটা এখন তার সঙ্গে এই রকম রোবটের মতো ব্যবহার করছে বটে, বলা যায় দুর্ব্যবহারই করছে, কিন্তু সে-ই যখন তার গ্রামে ফিরে যাবে, হয়তো এখান থেকে হাজার মাইল দূরের কোনো গ্রামে তার বাড়ি, সেখানে যখন সে তার বৃদ্ধা মাকে দেখবে, কেঁদে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, শিশুর হাতে সে-ই কিনে দেবে হাওয়াই মিঠাই, এই রোবটটাই তার প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখে মেঘ জমতে দেখলে তাকে হাসানোর জন্য কৌতুক বলবে, রসিকতা করবে।

পরিমল মজুমদার তার ছেলে পরিতোষকে সকালে মেরেছে, মেরেছে মানে মেরে তার পিঠেই একটা বেত ভেঙেছে, এখন একটা অচেনা বালিকার জন্য তার বড় মায়া বোধ হচ্ছে, সে দৌড়াচ্ছে ফাঁড়ি বরাবর, ওখানে খাবারের দোকান আছে, মুড়ি কি চিঁড়া মিলবে, গুড় মিলতে পারে, টোস্ট বিস্কুটের প্যাকেট, সল্টেড বিস্কুটও মিলে যেতে পারে বটে।

পরিমলকে দৌড়াতে দেখে কমান্ডার। সে বসে আছে তার সেই প্লাস্টিকের চেয়ারে। *সীমান্ত জনপদ* পত্রিকাটাই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে।

কী মজুমদার বাবু, দৌড়ান কেন? কমান্ডার গলা উঁচিয়ে পেপারের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে।

'আরে মেয়েটা সারাটা দিন না খেয়ে আছে। আরও তিনটা বাচ্চা আছে। আর আছে প্রেগনান্ট মহিলা। তাদের জন্য আমি দেখি কোনো খাবার পাওয়া যায় কি না।' মজুমদার গলা উঁচিয়ে বলে, দৌড়ানোর ফলে সে হাঁপায়, হাঁপাতে হাঁপাতেই কথাগুলো বলে।

তার কথাগুলো কানে যায় রসিকলালের। সে তখন কলপাড়ে বাসনকোসন ধোওয়ার কাজে অমলকে সাহায্য করছিল। অমলই সবকিছু মেজে পরিষ্কার করছে, রসিকলাল টিউবওয়েলের হাতল চেপে দিচ্ছে।

রসিকলাল কলচাপা বন্ধ করে। তার পোয়াতি বউয়ের কথা তার মনে পড়ে। পল্টুর মা না কী যেন নাম আওরতের, পেটটা কী রকম ধামার মতো, কী কষ্ট করেই না মহিলা সেই পেটের ওজন বয়ে বেড়াচ্ছে, এখনো না খেয়ে আছে! সেই কাল রাতে দুটো রুটি খেয়েছে কি খায়নি।

রসিকলাল কমান্ডারের কাছে আসে। স্যালুট করে মাটিতে পা ঠুকে। তার পরনে খাকি প্যান্ট, পায়ে রবারের স্যান্ডেল। পা ঠোকার ফলে শীতের শুকনো মাঠে ধুলো ওড়ে। রসিকলাল বলে, স্যার, ওরা যদি স্যার রাতেও ওই নো-ম্যান'স ল্যান্ডেই থাকে, তাহলে স্যার, আমি ওদের জন্য খাবার বানাই স্যার। বাচ্চালোক আছে। পোয়াতি আওরত আছে। আমাদের স্টকে যে পরিমাণ আটা আছে, তাতে এক মাসের খাবারে এমন কিছু টান পড়বে না। আমি ম্যানেজ করে নিতে পারব।

www.amarboi.com

কমান্ডার গোঁফ নাড়ে, একটা গোঁফ ধরে ডান হাতে টানে, তারপর বলে, আমরা কেন ওদের খাওয়াব। হলদিবাড়িওয়ালারা খাওয়াক।

হলদিবাড়িওয়ালারা যদি না খাওয়ায়? আর সাংবাদিক সাহেবের কথায় তো মনে হলো ওরা নলচেপাড়ার লাইনেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ওদের পুশআউট করে দিয়েছি। ওদের খাওয়ালে তো আমাদের পরাজয় হয়ে গেল। মানে ওদের দায়িত্ব আমরা নিয়েই নিলাম।

আমরা তো আর ওদের আমাদের বর্ডার ক্রস করতে দিচ্ছি না। শুধু দুইটা করে শুকনা রুটি আর একটু করে গুড় ধরিয়ে দিই?

না রসিকলাল। তুমি বড্ড মেয়েমানুষি করছ। পুরুষ মানুষ তুমি। তুমি রক্ষী। তোমার বুকের পাটা হবে পাথরের মতো শক্ত। তুমি কেন মেয়েমানুষের মতো কাতর হচ্ছ?

রসিকলাল লজ্জা পায়। সে তার এই কোমলতার কোনো কারণ দেখাতে পারে না। তার স্ত্রী কৃষ্ণাকে তার মা কত যত্নআত্তি করছে, সেই কথা কি আর কমান্ডারকে বলা যায়।

রসিকলাল কথা বলে না, আবার কমান্ডারের সামনে থেকে সরেও না। সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মজুমদার দোকানে যায়। মোয়া কেনে। একটা টিনের বাক্সের একপাশটা কাচের। তার মধ্যে মোয়া রাখা। সেই পুরো বাক্সটাই কিনে ফেলে কুড়ি রুপি দিয়ে। তারপর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভবেশ পাগলাকে বলে, ভবেশ, একটা কাজ করিবার পারবি?

কী কাম?

একটা বালতিত করিয়া এক বালতি জল ভরিয়া ওই উত্তরের দিকত বর্ডারত ধরি যাবার পারবি?

পারমো। মোক দুইটা মোয়া দেওয়া নাগবে।

আচ্ছা নিস তুই দুইখান মোয়া।

জল দিয়া কী করিবেন?

পুণ্যের কাজ করবি রে পুণ্যের কাজ করবি। তৃষ্ণার্তকে জল দিবি। নে। ও বিশু, তোমার বালতিটা একটু ধার নিতেছি বাহে। মগটাও দেও।

না, কেমন তোমরা বালতি নেন। টংয়ের দোকানে বসে পেটমোটা বিশু বলে। তার পরনে ধুতি। গায়ে উলের চাদর। তাকে দেখতে একেবারে গোলাকার হাঁড়ির মতো। মোর পানত সারা বেলা পানি দেওয়া নাগে। পানি না দিলে পান মোর পচি যায়।

আরে পাঁচ মিনিটও না লাগিবে। যামো আর আসমো। ভবেশ পাগলার বয়স ১৭-১৮ হবে। দেহখানা বড়, মুখটা হাঁ করা, সারাক্ষণ লালা ঝরছে। তার পরনে প্যান্ট, প্যান্টের জিপার খোলা, কোমরেও বোতাম নাই, একটা দড়ি দিয়ে প্যান্টটা কোমরে বাঁধা। তার গায়ে একটা লাল রঙের কলারওয়ালা গেঞ্জি।

মোয়ার কৌটা নিয়ে আগে আগে ছোটে পরিমল মজুমদার। ফাঁড়ির ভেতরের কল থেকে জল ভরে নিয়ে বালতি টানে ভবেশ পাগলা। তারা চষা জমিন ধরে ছোটে। তারা কাটা ধানখেতের মধ্য দিয়ে দৌড়ায়। বালতি থেকে জল ছিটকে পড়ে। ভবেশের প্যান্টের পা ভিজে যায়। পরিমল মজুমদার বলে, ভবেশ, পুরাটা জল ফির ফেলি না দেন বাহে। সাবধানে আইসেন। ওই দেখেন। ওই যে ভিড় জায়গাটা, ওইখানে হামরা যামো। ওমারগুলানক মোয়া আর জল খিলামো। ভগবান হামাক পুণ্য দিবে। হামরা স্বর্গ যামো।

ভবেশ হাসে। স্বর্গত যামো হামরা। ওমরা যাবার নোয়ায়?

ওমরা কারা? কার কথা পুছ করিস?

যামরা জল খাইবে? ওমরা স্বর্গত না যাইবে?

যাবার পারে। ওমরাও যাবার পারে বাহে। ভগবান কাক কখন কী করুণা দেয়, হামরা তা কবার পারি?

তারা সীমানা খুঁটির কাছে পৌছায়। পরিমল মজুমদার কৌটার মুখ খোলে। একটা একটা করে মোয়া সে দিতে থাকে সবার হাতে। ভবেশ সবার মুখে মগ দিয়ে জল ঢালতে থাকে। মুহূর্তে এত বড় কৌটা শেষ হয়ে যায়। বালতির জলও ফুরিয়ে যায় মোয়া শেষ হওয়ার আগেই।

ভবেশ হি হি হি করে হাসে। আরে মানুষগুলান কেমন করিয়া জল খায় দেখছেন।

পরিমল বলে, ভবেশ, তুই আরেক বালতি জল আন। যা

ক্যামেরা দিন। ছবি তোলা নিষেধ

দৌড়া।

ওমরা তো সোগ মোয়া খায়া ফেলাইছে। তোমরা না কইলেন মোক দুইখান মোয়া দিবেন। এলা কী হইবে?

তোক মুই বিস্কুট কিনি খিলাম এলা বাহে। যা জল ধরি আয়। যা ভাই। পুণ্য হইবে। মেলা পুণ্য।

হ। পুণ্য হইবে। পুণ্য হইলে মুই স্বর্গ যামো। হি হি হি।

যা ভাই। আরেক বালতি জল আন। যা।

পরিমলের বয়স চল্লিশের ওপরে। দৌড়ঝাঁপ করার বয়স আর তার নাই। তার বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা শুরু করেছে। সে হাঁ করে মুখ দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস নেয়।

ভবেশ পাগলা বালতিতে মগ বাড়ি দিয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে দৌড়ে চলে কলতলার দিকে।

পল্টুর মার শরীর আর চলে না। সে আর পারে না। ওই মোয়াটা, আর পানিটুকুন, তার শরীরটাকে যেন আরও ধসিয়ে দিয়েছে। সে আবার শুয়ে পড়ে। আর শোয়ামাত্রই তার দুচোখ বন্ধ হয়ে আসে।

ধূলিশয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে পল্টুর মা। পল্টু কাওয়ালের দলে হেড কাওয়াল হয়েছে। একটা সোনালি টুপি তার মাথায়, গায়ে টকটকে লাল পাঞ্জাবি আর পাঞ্জাবির ওপর নীল ভেলভেটের কটি, পরনে চোশত পায়জামা, পল্টু দরগায় বসে কাওয়ালি গাইছে। তার সামনে হারমোনিয়াম, পল্টু এক হাতে হারমোনিয়ামের বোতাম টিপছে, আর মুখের কাছে আরেক হাত তুলে ধরে কাওয়ালির সুরে সুরে নাড়ছে। পল্টুর বাবা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পল্টুর বাবা বলে, জানো, এই কটিটা আমি সেলাই করেছি। এর গায়ে একটা একটা করে পুঁতি আমি বসিয়েছি। আমার ছেলেকে কেমন মানিয়েছে দেখো। শোনো, তোমার ব্লাউজটা দিয়ো। আমি তাতে চুমকি বসিয়ে দেব।

পল্টুর মা বলে, তোমাকে এত কষ্ট করতে হবে না। তুমিও

www.amarboi.com

আমারবই.কম

কাওয়ালি গাও। আমি তোমার মুখেও মধু দেব। আর তোমার গলাও পল্টুর মতো মধুর হবে।

তখন পল্টুর বাবা বলে, কাওয়ালি? কাওয়ালি কেমন করে গায়?

পল্টুর মা তখন গলা ছেড়ে কাওয়ালি গাইতে শুরু করে। আলি আলি আলি আলি...

পল্টু বলে, মা তুমি মিঠাইয়ের দোকানে কাজ করো বলে তোমার গলা এত মিষ্টি। চলো তোমার দোকানে চলো। আমাকে মিঠাই দাও।

এই সময় তার ঘুম ভেঙে যায়। রোদ মরে আসছে। শীত পড়তে শুরু করেছে। পল্টুর মা মাটিতে শুয়ে আছে। কোথায়ই বা তার পল্টু, কোথায়ই বা পল্টুর বাবা!

ভবেশ পাগলা জল আনতে ফাঁড়ির ভেতরে কলতলায় গেলে রসিকলাল বলে, ওই পাগলা, পানি নয়া কই যাস?

ভবেশ বলে, স্বর্গ।

মানে কী?

কতগুলান মানুষ অটেকোনা মাটিত পড়িয়া আছে। ওমাক জল খিলাইলে স্বর্গ পামো। তাই মুই জল ধরি যাঁও। তোমরাও যদিল স্বর্গ পাবার চান, মোয়া ধরি, জল ধরি অটেকোনা যান।

রসিকলাল প্রতিজ্ঞা করে, সে নিজেই দোকান থেকে আটা কিনে এনে রুটি বানিয়ে ওই নারী-পুরুষগুলোকে খেতে দেবে। তা হলে তো আর কমান্ডার স্যার আপত্তি করতে পারবে না।

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে চরাচরে, নলচেপাড়ায়, হলদিবাড়িতে। নলচেপাড়া ফাঁড়ির গাছগাছালিতে পাখিরা ফিরে এসেছে। তাদের কিচিরমিচির শব্দে ফাঁড়ি এলাকা মুখরিত। সন্ধ্যা হতে না হতেই কুয়াশাও পড়তে শুরু করেছে। এক গামলা রুটি আর এক গামলা আলু ফুলকপির তরকারি নিয়ে রসিকলাল চলেছে নো-ম্যান'স ল্যান্ডের দিকে। তার সঙ্গে অমল। তার দুই হাতে দুই বালতি পানি। রসিকলালের কোমরে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা টর্চ। টর্চলাইটের সুইচ অন করা। চলন্ত পায়ে লেগে টর্চলাইট নড়ছে, আর আলোটা একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

দূরে কুকুর ডাকে। তারপর শুরু হয় শেয়ালের ডাক। অনিশ্চয়তার মাটিতে বসে থাকা কুড়িজন নারী-পুরুষের কাছে খাদ্য আর জল নিয়ে হাজির হয় রসিকলাল বাবুর্চি আর তার সহকারী অমল। কিন্তু তারও পেছন পেছন আরেকজন রক্ষীকে পাঠিয়ে দেয় কমান্ডার। সে খাবারের আগেই ওই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছায়, শোনো তোমাদের খানা দেওয়া হচ্ছে একটা মাত্র শর্তে। খাবার নিয়েই তোমরা এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। একটু পরে কুয়াশা নামবে। একটু পরে আর কোনো কিছুই দেখা যাবে না। এই সুযোগে তোমরা হলদিবাড়ি চলে যাবে। এই কথা যদি তোমরা দাও, তা হলেই কেবল তোমরা খানা পাবে।

লস্কর মৃধা বলে, জি আচ্ছা। আমরা চলে যাব। আমাদের খানা দাও। আমাদের পানি দাও।

খিদেয় তার পেট তখন চো চো করছে। আগে তো খাওয়া পড়ুক পেটে। আগে তো খানিক বল আসুক শরীরে। তারপর না যাওয়ার প্রশ্ন। যেতে তো তাদের হবেই। এইখানে তারা ধুঁকে ধুঁকে মরবে নাকি?

রসিকলাল প্রত্যেকের হাতে শাল পাতার ঠোঙায় খানা তুলে দেয়। প্রত্যেককে মগে করে জল খাওয়ায়। তারপর রসিকলাল ফাঁড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে। সমস্ত ফাঁড়ির সব রক্ষীর খাওয়ার ভার তার ওপরে। ওদের না আজ খেতে দেরি হয়ে যায়!

এর মধ্যে রক্ষীদের ডিউটি বদল হয়েছে। পরিমল মজুমদারও তার ক্যামেরা উদ্ধারের জন্য কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ফাঁড়িতে অবস্থান করছে। কমান্ডার বলে, মজুমদার বাবু, ক্যামেরা দিতে পারি। কিন্তু ফিল্মটা তো খুলে রাখতে হবে।

মেঘের উপর বাড়ি (২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আহমেদ

উপন্যাস মেঘের উপর বাড়ি(২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আহমেদ .mbt-email{ background:url(http://www.amarboi.net /img/0f68671e.png) no-repeat 0px 12px ; width:300px; padding:10px 0 0 55px; float:left; font-size:1.4em; font-weight:bold; margin:0 0 10px 0; color:#686B6C; } .mbt-emailsubmit{...

Read more

সেই দিন সেই রাত্রি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেই দিন সেই রাত্রি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় .mbt-email{ background:url(http://www.amarboi.net /img/0f68671e.png) no-repeat 0px 12px ; width:300px; padding:10px 0 0 55px; float:left; font-size:1.4em; font-weight:bold; margin:0 0 10px 0; color:#686B6C; } .mbt-emailsubmit{ background:#9B9895;...

Read more

চার্চিলের গোপন যুদ্ধ - তানভীর মোকাম্মেল

চার্চিলের গোপন যুদ্ধ তানভীর মোকাম্মেল ছেলেবেলায় মায়ের কাছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের গল্প শুনেছি: কীভাবে 'মা এট্টু ফ্যান দাও' বলে কাতরাতে কাতরাতে কলকাতার রাস্তায় মরে পড়ে থাকত অভুক্ত, কঙ্কালসার, শীর্ণ...

Read more

নারী পর্ব ০৯ - হুমায়ূন আজাদ

ডাউনলোড ক্লিক করুন নারী পর্ব ০৯ - হুমায়ূন আজাদ এবারের পর্ব "বালিকা" বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়, শত বছর পূর্বেই তিনি বলে গেছেন, 'আপনারা হয়তো শুনিয়া আশ্চর্য...

Read more

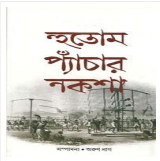

হুতোম প্যাঁচার নকশা

ডাউনলোড ক্লিক করুন হুতোম প্যাঁচার নকশা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বইটিতে কলকাতার সামাজিক ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এবং কলকাতার কথ্য ভাষাকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাংলা গদ্যের উন্নয়নে...

Read more

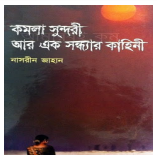

কমলা সুন্দরী আর এক সন্ধ্যার কাহিনী নাসরীন জাহান

ডাউনলোড ক্লিক করুন কমলা সুন্দরী আর এক সন্ধ্যার কাহিনী নাসরীন জাহান .mbt-email{ background:url(http://www.amarboi.net /img/0f68671e.png) no-repeat 0px 12px ; width:300px; padding:10px 0 0 55px; float:left; font-size:1.4em; font-weight:bold; margin:0 0 10px...

Read more

এখনো স্বপ্ন দেখায় - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ডাউনলোড ক্লিক করুন এখনো স্বপ্ন দেখায় - মুহম্মদ জাফর ইকবাল আপনাদের সহযোগীতা আমাদের একান্ত কাম্য। তাই যদি বইটি ভালো লেগে থাকে তাহলে দুচার লাইন লিখে আপনার অভিমতগুলো জানিয়ে...

Read more

সমরেশদা - মিহির সেনগুপ্ত

সমরেশ বসু (১১ ডিসেম্বর ১৯২৪-১২ মার্চ ১৯৮৮)। ছবি : নাসির আলী মামুন সমরেশদা - মিহির সেনগুপ্ত সমরেশদার কিছু খুচরো স্মৃতি মিহির সেনগুপ্ত তোমার মধ্যে একটা লেখার প্রবণতা আছে...

Read more

Buy Now Sarodia 2011

Receive New Bangla Books in your Inbox by submitting your Email ID.

Enter email address here | Submit

340 readers | Like 2K

BY FEEDBURNER

If You Like Us, Click On +

77

For Mobile Browser Click Here
m.amarboi.com

RECENT POSTS | COMMENTS

মেঘের উপর বাড়ি (২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আহমেদ
28 08 2011

সেই দিন সেই রাত্রি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
10 08 2011

চার্চিলের গোপন যুদ্ধ - তানভীর মোকাম্মেল
10 08 2011

আমার বই পাঠকদের জন্য একটি প্রশ্ন
10 08 2011

নারী পর্ব ০৯ - হুমায়ূন আজাদ
09 08 2011

সুইসাইড - রফিকুর রশীদ
05 08 2011

www.amarboi.com

মজুমদার বলে, ফিল্ম খুলে রাখলে আমি ফিল্ম পাব কোথায়। আর এই ফিল্মের রিলে আমার অনেক জরুরি ফটো তোলা আছে। সেসব তো নষ্ট হয়ে যাবে।

কমান্ডার বলে, গেলে যাবে। কিন্তু এই ফটো আমি বাইরে যেতে দিতে পারি না।

আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এই ফটো আমি নষ্ট করে ফেলব। কোথাও দিব না। ওয়াশও করব না।

আপনার কথায় আমি অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু এটা এমন একটা জিনিস যা আমি কিছুতেই আপনাকে দিতে পারি না। কারণ এটা কেবল আপনার আর আমার ব্যাপার না। এর পেছনে আছে অনেক বড় স্বার্থ। অনেক বড় ভাবমূর্তির প্রশ্ন। আমাকে অবশ্যই এই ফিল্মটা খুলে রাখতে হবে।

আচ্ছা আমি এক কাজ করছি। অন্ধকার ঘরে গিয়ে ফিল্মটা খুলে আপনাকে দিচ্ছি। আপনি নিজে এটা ফুলতলি বাজারের স্টুডিওতে দিয়ে ডেভলপ করাবেন। তারপর ওই ফটোটা নিয়ে বাকিগুলো আমাকে দেবেন।

দূরে শেয়াল ডাকে। অন্ধকার ঘন হয়ে নামে। কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় পুরো নলচেপাড়া আর হলদিবাড়ি। কী যে ভয়ংকর শীত। আবার একটু একটু করে হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে। রক্ষীরা মোটা কাপড়ের উর্দি, তার ওপরে সোয়েটার, পায়ে উলের মোজা, জুতা, মাথায় ক্যাপ, গলায় মাফলার পরেও সেই শীতে কাঁপতে থাকে।

তাদের সামনে বিশটা মানবদেহ পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে থেকে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে।

তখন নির্দেশ নিয়ে এক রক্ষী আসে ফাঁড়ি থেকে। এখনই এদের লাঠিচার্জ করে দূর করে দাও। রাতের অন্ধকার আর কুয়াশার আড়ালই কেবল পারে এদের নলচেপাড়া থেকে বিতাড়ন করতে।

তখন ডিউটিরত রক্ষীরা প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করে। তারা বন্দুকের বাঁট দিয়ে দলা পাকানো শরীরগুলোতে পেটাতে শুরু করে। মুভ। হট যাও। চলে যাও। যেখানে খুশি চলে যাও। প্রহারের শব্দ, কান্না, চিৎকার ওই নিধুয়া পাথারের নীরবতা ভেঙে দেয়। কুকুরদল দূরে চিৎকার করে ওঠে। পল্টুর মার পাছায় বাড়ি পড়ে, কারণ সে নড়তে পারছিল না, মায়ার মাথা অল্পের জন্য বেঁচে যায়, কারণ বন্দুকের বাঁট আসছিল তার মাথাসমান উচ্চতা ধরে, মাথা বাঁচাতে অন্ধকারেই সে মাথায় হাত রাখে, তার এক হাতের কনুই বরাবর আঘাত লাগে, লস্কর মৃধা দুই হাতে একটা বন্দুক আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়, অন্ধকারে, কুয়াশায়, জ্যোৎস্নায় তার মাথার পেছন থেকে যে তরল উষ্ণ ধারা নির্গত হয়, তার রং ঠাওর করা যায় না বলে কেউ অতিরিক্ত আতঙ্কিত বোধ করে না।

দলা পাকানো মানবশরীরের কাফেলাটা উঠে আস্তে আস্তে পুব দিকে যেতে থাকে। যেদিকে একটা চাঁদ উঠেছে, তার বিপরীত দিকে যায় তারা। অন্ধকার পথ চলতে গিয়ে তারা হোঁচট খেয়ে পড়ে। গাছের শুকনো ডালের সঙ্গে পা বেঁধে কেউবা পড়ে যায়। আস্তে আস্তে তারা রক্ষীদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ কমে আসে, তখন শিয়ালের হুক্কাহুয়া দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ের মতো করে বাজে, মনে হয়, কে যেন চরাচরজুড়ে কেঁদে চলেছে। কুয়াশার চাদর ধরে ঝুলন্ত চাঁদটাকে আকাশের একটা কোণে সামান্য একটা সান্ত্বনাচিহ্নের মতো দেখায়।

তারা হাঁটে। এই সুযোগ। তারা হলদিবাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়বে। তবে যেখানে ওই পারে প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে, অস্ত্র হাতে, সেদিকে চেষ্টা করে লাভ নাই। ফলে, লস্কর মৃধার নির্দেশে তারা আরও উত্তর দিকে সরতে থাকে। শটিবন মাড়িয়ে, ছোট ছোট কাঁটাগুল্মের ঝোপঝাড় পেরিয়ে একটা জায়গায়, কুয়াশার মধ্যে, অন্ধকারের অতলে কয়েকটা ঝিঁঝিপোকার মতো, তারা একটা জায়গায় সমবেত হয়। লস্কর মৃধা বলে, শোনো, এরপর কেউ কোনো কথা বলবে না। কেউ হাঁচি কাশি দিতে পারবে না। কোনো বাচ্চা কাঁদতে পারবে না। আমরা এখন হলদিবাড়ির দিকে পা বাড়াব। এই অন্ধকারে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। আমরা পূর্বে হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে যতদূর যাওয়া যায়, আমরা যাব। ভোররাতে আমরা থামব, ভাগ্য আমাদের যেখানে থামায়।

পল্টুর মা বলে, আমার পল্টু। পল্টুর বাপ। তাদের ছেড়ে আমি যাব না। লস্কর মৃধা তার মাথার পেছনে হাত দিয়ে এরই মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত পরখ করতে করতে বলে, আরে আগে প্রাণে বাঁচো। নইলে পল্টুকেও পাবে না। পল্টুর বাপকেও পাবে না। আমরা ওই পারে গিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে বের করব। তারপর তুমি পল্টুর বাপকে চিঠি লিখবে। সে এসে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তাই না?

পল্টুর মা একটা আশার আলো যেন, ওই কুয়াশাঢাকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে, কোন দূরতম অচেনা দ্বীপে, দেখতে পায়। সে তার পল্টু আর পল্টুর বাপকে আবার ফিরে পাবে?

তারা হাঁটে। তাদের পেছন পেছন হাঁটে তিনটা শেয়াল। বোধ করি শেয়াল তিনটাকে চাঁদে পেয়েছে, নইলে তারা এই দুপেয়ে জীবগুলোর পেছনে হাঁটতে যাবে কেন? নাকি তারা রক্তের গন্ধ পেয়েছে?

মায়া ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ার মা তাকে কাঁধে ফেলে কোনো রকমে পা ফেলে হাঁটে।

লিটন কাঁদে, মা আমার পায়ে কাঁটা বিঁধেছে।

লস্কর মৃধা চাপা গলায় বলে, এই কে কাঁদে? কেউ কাঁদবে না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা উত্তরে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ডানে পূর্বদিকে হলদিবাড়ির সীমানার দিকে চলে যায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। এই জায়গায় কতগুলো শুকনো ধনচেগাছ। তারা ডানে সরে। সরতে সরতে একসময় একটা সীমানা খুঁটি দেখতে পেয়ে নিশ্চিত হয় যে তারা ঠিক জায়গাতেই আছে। এবার তারা ঢুকে পড়বে হলদিবাড়িতে। ঠিক সেই সময় টর্চের আলো এসে পড়ে তাদের ওপর। তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওপার থেকে তখন বাজখাঁই গলার আওয়াজ আসে, খবরদার। তোমরা আর এক পা আগানোর চেষ্টা করবা না। আগানোর চেষ্টা করলেই আমরা গুলি করব।

টর্চের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। কাফেলাটা হতাশ। তারা ওইখানেই মাটিতে বসে পড়ে। অন্ধকারে, কুয়াশার গায়ে, অনেকগুলো টর্চের আলো নানা ধরনের আলোর নড়ন্ত রেখা তৈরি করে।

প্রহরীরা নড়ে না। তারা নো-ম্যান'স ল্যান্ডে ঢুকবে না। আবার তারা তাদের সীমানার ভেতরে কাউকে প্রবেশ করতেও দেবে না।

কাফেলাটা ক্লান্ত, ধ্বস্ত। বিফল মনোরথ। হতাশ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চলৎশক্তিহীন।

তারা মাটিতে বসে। কেউবা শুয়ে পড়ে। তাদের পেছনে তিনটা শেয়াল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

তখন শীত এসে তাদের জেঁকে ধরে, ওই শিয়ালদের আর এই দুপেয়েদের। শেয়াল তিনটা গর্তে গিয়ে লুকোয়। সেখানে খানিকটা ওম তারা পায়। দুপেয়েগুলোর যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। এত বড় পৃথিবী। কত জমিন, কত পাহাড়, কত নদনদী, কত গাছপালা জঙ্গল। মানুষ কেউবা নদীবক্ষে থাকে, কেউবা সমুদ্রবক্ষে, কেউ থাকে পাহাড়চূড়ায়, সবারই মাথার ওপরে একটা ছাদ থাকে, নয়তো পায়ের নিচে থাকে মাটি, কারাবন্দীদেরও একটা ঠিকানা আছে, একটা গন্তব্য আছে, একটা নিশ্চয়তা আছে, ভবিতব্য আছে, কিন্তু এই কুড়িটা মানুষের কোনো ঠিকানা নাই, কোনো ঠাঁই নাই। শেয়ালও তো তার গর্তে ঘুমোয় উষ্ণতায় আর স্বজন সান্নিধ্যে, কাঠবিড়ালিরও আছে গাছের কোটর, কৃমিদেরও আছে মানুষের পাকস্থলী, শুধু এই কুড়িটা আদমসন্তানের কোনো আশ্রয় নাই, কোনো গন্তব্য নাই, কোনো নিশ্চিতি নাই।

উত্তুরে বাতাস আরও জোরে বয়। শীতে ককিয়ে ওঠে ছোট্ট লিটন, বাঁকা হয়ে আসে মায়ার হাত-পা। তারা পরস্পরের গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে নিজেদের শরীরের ওমটুকু ধরে রাখতে চায় আর সেই তাপে বাঁচতে চায় নিজে, বাঁচাতে চায় অনিশ্চয়তার একই তরণীতে ওঠা অন্য যাত্রীদের। কিন্তু শীত যে সেবার সব রেকর্ড ভঙ্গ করবে বলে এসেছিল। ওরা বুঝি বাঁচবে না। ওরা বুঝি মরেই যাবে, ওইখানে।

তখন লস্কর মৃধার মাথায় একটা চিন্তা আসে। তার পকেটে একটা দেশলাইয়ের কাঠি আছে। আর ওই দূরে ধনচেগাছ মরে শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে।

সে ওঠে। তার সঙ্গে নেয় আরও দুজনকে। তিনজন মিলে তিন বোঝা ধনচে ডাল সংগ্রহ করে ফিরে আসে। দূর্বাঘাস বিছানো জায়গাটায় সেই শুকনো ডালপালার স্তূপ সাজিয়ে তাতে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। আগুন জ্বলে ওঠে। মানুষগুলো সেই আগুন ঘিরে বসে। উত্তাপ সঞ্চারিত হয় তাদের শরীরে। তারা হাত মেলে ধরে আগুনের ওপরে। এই সময়, সেই

www.amarboi.com

ভীষণ রাতে, শীতের কামড়ে মৃতপ্রায় পশুপাখিরাও একটু উষ্ণতার সন্ধানে সেই আগুনের চারপাশে মানুষের পেছনে এসে দাঁড়ায়। বেজি, আর গিরগিটি, শিয়াল আর কাঠবিড়ালি, চুপচাপ এসে মানুষের কাছাকাছি এসে আগুন পোহায়। আসে পতঙ্গরাও, ঝাঁক বেঁধে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই আগুনে, আত্মাহুতি দেয়।

পালা করে তারা ধনচের শুকনো ডাল, মরা শটিগাছ জোগাড় করে আনে। আর আগুন জ্বালায়। না-মানুষি জমিনের ওই পাড়ে প্রহরীরাও হাত বাড়িয়ে সেই আগুনের আঁচ গায়ে টেনে নেয়।

ভোরের দিকে, যখন আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে, তখন পূর্বপারের প্রহরীদের মাটিতে বসা আর ঘুমন্ত বলে বোধ হয়। এই সুযোগ। এবারই ঢুকে যেতে হবে হলদিবাড়িতে।

লস্কর মৃধা বড়দের ডেকে তোলে। ছোটদের কোলে নেওয়া হয়। পল্টুর মা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। তার হাতে পড়ে পাওয়া একটা গাছের ডাল দেওয়া হয়। তারা নিঃশব্দে হেঁটে হেঁটে হলদিবাড়ির সীমানা খুঁটি পার হয়ে যায়। এই সময় হঠাৎই একজনের পা একটা মরা সাপের ওপর পড়ে, সে মনের অজান্তে ওরে বাবা বলে চিৎকার ওঠে। তার দেখাদেখি অন্যরাও চিৎকার করে সরে গেলে ঘুমন্ত প্রহরীরা জেগে ওঠে। তারা দেখতে পায়, তাদের উদ্দিষ্ট মানুষেরা সীমা লঙ্ঘন করছে। তারা তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। লাঠি হাতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে তারা মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এই নরনারী শিশুদের ওপর। বেধড়ক পেটায় তারা, চোখে পিঁচুটি, শরীর তখনো অর্ধেক ঘুমে, তারা নির্বিচারে পিটিয়ে চলে। আহত, রক্তাক্ত, ভীত মানুষগুলো আবার ফিরে আসে না-মানুষি জমিনে।

সকাল হতে না হতেই আবার রোদের তেজ দেখা যায়। কুয়াশা ধীরে ধীরে অপস্রিয়মাণ। শটিবনের সবুজ সকালের রোদে আর শিশিরে ঝকমকিয়ে ওঠে। হাবিলদার জয়নাল সামনের সবুজ গালিচায় পড়ে থাকা কতগুলো রঙিন কাপড়চোপড়ের দিকে তাকায়। তারপর তার দৃষ্টি পড়ে কাপড়চোপড়ের সঙ্গে থাকা কতগুলো মুখের দিকে। সে হাতের দুরবিন দিয়ে মুখগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখে। এরা কি বৈধ না অবৈধ, পুবের না পশ্চিমের, হলদিবাড়ির না নলচেপাড়ার, এই চিন্তা মাথা থেকে উবে যায়, একেকটা মুখের অধিকারী সত্তাগুলোকে তার মানুষ বলে প্রত্যয় হতে থাকে। সে দেখতে পায় একটা বাচ্চা মেয়ের মুখ। দুরবিনটা একটু নেড়ে সে দেখে একটা নারীমুখ, তার দুই চোখ, নাক, নাকফুল। সে দেখে একটা বাচ্চা ছেলের মুখ। সে দেখে একজন হতাশ যুবক, আধমরা। সে দেখে একটা পেট, উঁচু, সন্তানসম্ভবা। তার বড় মায়া হয়। এরা কাল থেকে এই খোলা আকাশের নিচে। এরা খাচ্ছে কী! এরা পান করছে কী! এরা মলমূত্র ত্যাগ করছে কোথায়?

হাবিলদার নির্দেশ দেয়, কাদের মিয়া, বাবুর্চিকে অর্ডার দেও, এদের লাইগা খানা পাকাক। এদের তো আমরা আমগো মাটিতে ঢুকতে দিমু না, কিন্তু দুইটা ভাত দিলে তো আমগো কিছু কমব না। বরং আল্লায় সোয়াব দিব। কাদের মিয়া তাদের ফাঁড়িতে যায়। শানের মেঝে, তার ওপরে বাঁশের বেড়া, তার ওপরে ঢেউটিনের দোচালা, এই হচ্ছে এখানকার ফাঁড়ি। তবে বাঁশের বেড়ার নিচের অংশে কালো আর ওপরের অংশে লাল রং করা। পুরো জায়গাটাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাফসুতরো করে রাখা। এক কোণে পাকঘর। সেইখানে নিজামুদ্দি রান্না করে। এখন সে কোটাবাছা করছে। দুপুরে তারা ভাতমাছ খাবে। কাদের মিয়া নিজামুদ্দিকে বলে, হাবিলদার সাবে কুড়িজনের খানা রানতে কইছে।

কুড়িজন? কারা খাইব?

ওই যে ইল্লিগালরা?

অগো আমরা ক্যান খাওয়ামু?

কী জানি। হাবিলদার সাবে কইল, সোয়াব হইব।

অগো খাওয়াইলে সোয়াব হয় কেমনে?

আমি তার কী জানি। সাবে অর্ডার দিছে। আমি তোমারে জানাইলাম।

কী খাইব? পোলাও কোর্মা?

পারলে খাওয়াও।

আইচ্ছা দেহি। খিচুড়ি রাইন্ধা দিই। তাইলে আর তরকারির ঝামেলা থাকে না। কোথাইকা যে এই আপদগুলান আইয়া জুটে।

নিজামুদ্দি ডাল ধোয়, চাল ধোয়, মরিচ-পিঁয়াজ কাটে, চুলায় খিচুড়ি চড়িয়ে দেয়। কাঠের চুলা। ধোঁয়া ওঠে। নিজামুদ্দি বাঁশের চোঙ দিয়ে চুলায় ফুঁ দেয়।

এত শীত এই এলাকায় এর আগে কখনো পড়েনি। শীতে যেন কলের পানি বরফ হয়ে যাবে। শীতে বাঁশঝাড়ের কঞ্চিতে বসা শালিক পাখিরা মরে টুপটাপ করে ঝরে পড়তে থাকে বাঁশের পাতার মতন। নলচেপাড়া আর হলদিবাড়ি গ্রামের মানুষেরা, গৃহস্থ, কৃষক, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, ভিক্ষুক, কামলা, ভ্যানচালক, দোকানদার, ঘরামি, কামার, মাছুয়া, কাঠমিস্ত্রি, মাস্টার, যে যার সাধ্যমতো ঘরে শীতে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাঁশের বেড়া শীত মানে না, হু হু করে বাতাস ঢোকে, বরফের সুই যেন বিদ্ধ করে একেকটা শরীরে। হাত-পা যেন নিজের শরীরের অঙ্গ নয়, নিজের আদেশ তারা পালন করতে পারে না। গামলায় কয়লার আগুন নিয়ে হাত-পা সেঁকে কেউ, কেউ বা উঠোনে খড়কুটো, কাঠ, ডাল একত্র করে অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে সপরিবারে তার চারপাশে বসে থাকে। আর পড়ে কুয়াশা। এমন কুয়াশা যে দুই হাত দূরে কী আছে, কিছুই দেখা যায় না।

এইই সুযোগ। চলো আমরা চলে যাই। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে থাকা মানুষদের প্রস্তাব করে লস্কর মৃধা।

কোন দিকে যাব? কিছুই তো দেখা যায় না।

আমি থাকব সবার আগে। আমার পিঠ ধরো একজন। তারপর তার পিঠ ধরো একজন। আমরা এইভাবে রেলগাড়ি রেলগাড়ি খেলার মতো করে একসাথে চলে যাব। আমার পিছে আসো সবাই। আগুনের কাছটাতে তবু এর ওর মুখ দেখা যায়। একটু দূরে কিছুই দেখা যায় না। চলো সবাই। এইখানে আমার পিছে পিছে লাইনে দাঁড়াও।

ওরা আগুনের কিনারে লাইন করে। লস্কর মৃধা। তার পেছনে একজন। তার পেছনে আরেকজন। সবার পিছনে পল্টুর মা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে তারা এগোতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কুয়াশা এত ঘন হয় যে কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সামনের জন পেছনের জনের মুখ আর দেখতে পায় না। তবুও তারা হাঁটে। একসময় পল্টুর মার হাত তার সামনের জনের পিঠের শার্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবু সে মানুষের গন্ধে গন্ধে হাঁটে। বেশ খানিকক্ষণ চক্কর খাওয়ার পরে সে নাকে আর কোনো মানুষের গন্ধ পায় না। সে তখন চিৎকার করে বলে, কেউ কি আছো তোমরা? কেউ কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ।

কেউ তার কথার জবাব দেয় না।

পল্টুর মার পা আর চলে না। সে বসে পড়ে। কুয়াশার ভেতরে সে চুপ করে বসে নিজের শ্বাসের শব্দ শোনে।

তখনই তার পেটের ভেতরের পানি ফেটে যায়। রক্তপাত হতে থাকে। তার বেদনা ওঠে। সে দু পা ফাঁক করে শুয়ে থাকে। প্রচণ্ড ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। উঠে বসে। মাটিতে আঁচড়ে থাবলা ঘাসমাটি তুলে ফেলে। কুয়াশা আর কুয়াশা। ব্যথা আর কষ্ট।

বাকি রাত ব্যথায় কাতরায়। ঠান্ডায় জ্ঞান হারায়। আবার তার জ্ঞান ফিরে আসে। তখন বোধ করি সকাল হয়ে গেছে। কালো ভাবটা নাই। শুধুই সাদা। সাদা অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের ভেতরে, মাটিতে বসে পড়ে, দু পা ফাঁক করে, হাত দুটো পেছনে মাটির ওপরে রেখে—রক্তাক্ত পাজামা তো আগেই খুলে ফেলেছে—সর্বশক্তি দিয়ে পেটের ভেতরের বাচ্চাটাকে বের করতে চায়। মাথাটা বেরিয়েছে বলে মনে হয়। সে চাপ দেয়। চাপ দেয়। ইয়া খুদা। ইয়া খুদা। ও আউলিয়া। রহম করো।

রক্তপাত। আর্তনাদ। ভীষণ বেদনা। অবশেষে সে তার সন্তানটিকে সত্যিকার অর্থেই ভূমিষ্ঠ করতে সক্ষম হয়। তার কানে কান্নার আওয়াজ আসে। তার একটা তৃপ্তি হয়। একটা মানবসন্তানকে সে জন্ম দিতে পেরেছে। তার পল্টুর জন্মদিনের কথাটা মনে পড়ে। তখন তারা আরেকটা বস্তিঘরে থাকত। সেই ঘরে তারা শুত মাটিতে, মাদুর পেতে, তার ওপর কাঁথা বিছিয়ে। সেখানেই পল্টুর জন্ম হয়েছিল। দাইটা ছিল খুবই দক্ষ। পেটে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে মাথাটা বের করে নিয়ে সে কী যে একটা করল, পল্টু সহজেই বেরিয়ে এল। তার নাঁড়ি কাটা হয়েছিল ব্লেড দিয়ে। সেই ব্লেড ডেটলে ধুয়ে নিয়েছিল দাই। সে বলেছিল, পরিচ্ছন্নতা হলো আসল। পরিষ্কার থাকতে হবে। এই মাটির বিছানা চলবে না। চকি আনতে হবে। পল্টুর বাপ সেইদিনই একটা চকি কিনে এনেছিল ঘরে।

পল্টু এখন কোথায়? পল্টুর বাপ কী করে? তার সমস্ত শরীর

www.amarboi.com

ঘুমে ভেঙে আসছে। গভীর ঘুম তাকে গ্রাস করে ফেলছে। পল্টুর ভাই হলো নাকি বোন। উঠে দেখার মতো শক্তি আর তার শরীরে নাই।

পল্টুর মা জাগরণহীন ঘুমে তলিয়ে যায়।

আর তার পাশে একটা সদ্য জন্মানো মানবশিশু তারস্বরে তার জন্মবার্তা ঘোষণা করতে থাকে।

তারপর কখন যে কুয়াশা কেটে গেছে, কে জানে। রোদ ওঠে। আকাশ থেকে কুয়াশা তাড়িয়ে সূর্য দখল নেয় দিবসের। শটিবনে বেগুনি ফুল স্পর্ধিত ভঙ্গিমায় তাকায় সূর্যের দিকে। কাঠবিড়ালিগুলো দৌড়ে বেড়ায় না-মানুষি জমিনজুড়ে। গিরগিটির গলায় রং বদলায়।

দুই পারে, প্রহরারত রক্ষী আর প্রহরীরা দেখে, বাকি উনিশজন মানুষ উধাও, কোথাও কেউ নাই। শুধু ওই পেটমোটা মহিলাটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আর তার পাশে শুয়ে আছে একটা ছোট্ট মানবশরীর। তার কান্নার আওয়াজ বুঝি শোনা যায়! নাকি কি যায় না।

ভবেশ পাগলাই প্রথম খবরটা ছড়িয়ে দেয় নলচেপাড়ায়। ভবেশ সকাল বেলা নো-ম্যান'স ল্যান্ডে উঁকি দিয়েছিল এই লোভে যে স্বর্গের উর্বশী অপ্সরা না হোক, দু-চারটা মিঠাই মণ্ডা কি ওই না-মানুষি জমিনে পড়ে থাকবে না? পরিমল সাংবাদিকের সঙ্গে একদিন আগে সে নিরন্নকে অন্ন দিয়েছে, তৃষ্ণার্তকে জল, তাতে কি তার পুণ্য কিছু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হয়নি। আর সেই পুণ্যবলে স্বর্গের দুয়ার যদি খুলে যায়, কিছু মিষ্টি মণ্ডা খাজাগজা তো ওই নো-ম্যান'স ল্যান্ডেই পড়বে। ভবেশ পাগলা আগের দিন ঘটনাস্থলে যায়, কোনো মানুষজন সেখানে নাই, না থাকুক, কিন্তু স্বর্গের কোনো লক্ষণ, কোনো প্রসাদ কি কোথাও থেকে ভেসে আসতে পারে না? কিন্তু সে-রকম কিছু না দেখে সে এদিক-ওদিক তাকায়। তখনই তার চোখে পড়ে ওই রঙিন কাপড়, একটা আস্ত কাপড়ের খণ্ড, নীল রঙের জামা, লাল রঙের চাদর, আর তারই পাশে একটা মানুষের বাচ্চা। সে রক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওই দেখো স্বর্গ থাকিয়া নিষ্পাপ বাচ্চা আসি গেইছে। মোর প্রসাদও আসি যাইবে।

রক্ষীরা দুরবিন বাগায়। সত্যি তো বাচ্চাটার হাত-পা নড়ে। আর মা-টা? মনে হয় মরেই গেছে। আর বাকি লোকগুলো? ওই যে উনিশ ইল্লিগ্যাল মাইগ্রান্ট? না, তারা জাস্ট ভ্যানিশড। বড় তাজ্জব কথা।

ভবেশ তাজ্জব হয় না। সে ভীষণ খুশি। একটা জিগাগাছের ডাল তার হাতে। সেটা ঘুরিয়ে পথের ধারের নিরীহ গাছপালাগুলোকে পেটাতে পেটাতে সে দৌড়ায়, আর ঘোষণা করে, স্বর্গ থাকিয়া বাচ্চা পাঠাইছে, নো-ম্যান'স ল্যান্ডত। পল্টুর মায়ের উঁচা প্যাট নামি গেইছে। কাঁয় কোটে আছেন বাহে শোনেন ক্যানে জরুরি খবর। স্বর্গ থাকিয়া নিষ্পাপ বাচ্চা আসি গেছে। এরপর হামার লাগি প্রসাদ আসিবে। হামার আর দুঃখ কষ্ট থাকিবে না। পল্টুর মাও নিন্দ পাড়ে। তার বগলত তার কাচুয়া ছাওয়াল হাতপাও নাড়ে।

হোমিওপ্যাথির ডাক্তার বাবু বাসুদেব ধর, পেটমোটা বিশু দোকানি, লম্বা পেটানো শরীরের কমান্ডার, ঝোলানো গোঁফের রসিকলাল বাবুর্চি, সবাই শুনতে পায় ভবেশ পাগলার ঘোষণা। ভবেশ পাগলা দৌড়ে ফাঁড়ির মধ্যে গিয়ে কমান্ডারের রোদ পোহানো টেবিল থেকে একটা দৈনিক *সীমান্ত জনপদ* কাগজ তুলে নিয়ে কোণ বানিয়ে মাইকের আকার দেয়, তারপর তার অমায়িক কণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে, নো-ম্যান'স ল্যান্ডত দেবশিশু আসিয়া গেছে।

হলদিবাড়ির প্রহরীরাও ঘটনা টের পায়। নিজামুদ্দি বাবুর্চির কানে কথাটা গেলে, সে ওই গ্রামে বসবাসরত তার স্ত্রী, যে কিনা আগে এই প্রহরী ফাঁড়িতে আসত রান্নাবান্নার সাহায্যের জন্য, এখন নিজামুদ্দির বউ হয়ে যাওয়ায় সে আর এই ফাঁড়িতে কাজে আসে না, কারণ তাতে নিজামুদ্দির প্রেস্টিজে লাগে, (আসল কথা, একদিন তার স্ত্রী মর্জিনা কলতলায় বাসন মাজছিল, এই সময় তার ব্লাউজের বড় গলা দিয়ে তার স্তনের কিয়দংশ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল, তখন নিজামুদ্দি প্রথমে তাকায় তার হাবিলদারের চোখের দিকে, হাবিলদারের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে তাকায় তার স্ত্রীর বুকের দিকে, তখনই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে মর্জিনাকে আর এই ফাঁড়িতে কাজ করতে দেওয়া সংগত হবে না), তাকে এই খবরটা দেয়। মর্জিনার ছেলেপুলে নাই। বাঁজা মেয়েমানুষ নিয়ে নানা সমস্যা। তার শরীরে তাকদ আছে। কিন্তু কোল জোড়া একটা সন্তান না থাকলে মাইয়া মানুষ ঠিক জুতে আসে না। মর্জিনা খবরটা শোনামাত্র প্রথমে নীরক্ত ও নিসাড় হয়ে পড়ে, তারপর কয়, ছাওয়াটা কোটে? আগে তো তাক বাঁচান লাগে, তারপর না অন্য কথা। নিজামুদ্দি বলে, কেমনে বাঁচাইবা? তোমার বুকত তো আর দুধ নাই যে বাচ্চাটারে ধইরা আইনা বুকের দুধ খাওয়াইবা? মায়ের দুধ ছাড়া বাচ্চা বাঁচে?

মর্জিনা বলে, কেন গরুর দুধ খিলামো!

সেইটা খাওয়াইন্না মানষের অভাব হইব না।

আমি উয়াকে নিজের বেটার মতন করিয়া মানুষ করমো।

বেটা না বেটি তুমি জানলা কেমনে?

বেটা না হইলে বেটি হইবে। মানষের বাচ্চা তো?

হইল মানুষের বাচ্চা? হেন্দু না মুছলমান, এই পারের না ওই পারের সেইটা তো কেউ জানে না।

বাচ্চার আবার হেন্দু মুছলমান কী গো? আর এই পার না ওই পার? তুমি না কইলেন বাচ্চা জন্মাইছে নো-ম্যানস ল্যান্ডত, তার আবার এপার-ওপার কী!

তাই তো? নিজামুদ্দি বাবুর্চির মাথায় তখন এই প্রশ্নটা জট পাকাতে থাকে, নো ম্যান'স ল্যান্ডে জন্মানো শিশু কোন পারের, এইটা কীভাবে নির্ণীত হবে। বিশেষ করে যখন তার বাবা-মায়ের পরিচয়ও জানা যায় না এবং বাবা-মায়ের দেশজমিন নিয়ে প্রশ্ন মীমাংসিত নয়!

মর্জিনা বলে, মুই বাচ্চাটাক এক নজর দেখিম। মুই এলায় যাওঁ।

নিজামুদ্দি বলে, আরে পরে যাও। আগে দেখি, কী হয়, না হয়।

মর্জিনার বাড়ির উঠোনটা কাঁঠালগাছের ছায়ায় শীতল, কাঁচাবাড়ি, খড়ের চাল, তবে উঠোনটা নিকোনো। মর্জিনার গায়ের রং ধবধবা ফরসা, যেটা একটা রোগ বলেই কেউ কেউ মনে করে থাকে। কিন্তু নিজামুদ্দি তার এই ধবধবা ফরসাত্ব দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল।

লাল রঙের কাঁঠাল পাতা আঙিনায় টুপটাপ ঝরে।

মর্জিনা খোঁপা করে শাড়ির আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে বলে, হাঁটো। এলায় যামো।

নিজামুদ্দি তাকে নিষেধ করতে পারে না।

তারা দুজন আলপথ ধরে প্রহরীদের ফাঁড়ির নিকটস্থ ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হয়।

ফাঁড়ির সামনে দিয়ে যখন উত্তরের দিকে বাচ্চা আর তার মৃত মাতার অবস্থানস্থল অভিমুখে স্বামী-স্ত্রী ধাবমান, তখনই সিপাহি রুস্তম চিৎকার করে ওঠে, নিজামুদ্দি মিয়া, কই যাও। আহো, হাবিলদার সাবে জরুরি মিটিং দিছে।

বাচ্চা দেইখা আহি মিয়া। তোমগো ভাবি শখ করছে।

বাচ্চা পরে দেইখো। বহুত জরুরি মিটিং। আহো।

আমি বাবুর্চি মানুষ মিটিং গিয়া কী করুম।

আরে তুমি চাকরি করো না। আহো।

মর্জিনা বলে, তুমি যাও। মুই যাবার পারমো। ওই তো দেখা যায় ভিড়। অটে তো?

হ। যাও গা তাইলে। আমি মিটিং করি।

মর্জিনা চষা ধানখেত পেরিয়ে, হলুদ শর্ষে খেত মাড়িয়ে, জলাহীন নালাটা পাড়ি দিয়ে, নালার ধারে বিষকাটালির ঝোঁপে ফড়িঙের মেলা দেখে খানিকটা থেমে, একটা ফড়িং ধরার বৃথা চেষ্টা সম্পন্ন করে সীমানার সেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ায়, যেখান থেকে বাচ্চাটাকে আর বাচ্চার মৃত মাকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখা যায়। এখান থেকে হাত দুইশ কি তিনশ দূরে, ওই যে বাচ্চাটা দেখা যায়। তবে বাচ্চাটার চেয়ে বাচ্চার মাকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাচ্চার মায়ের নাভিমূলটা তবু তার বড় নীল কামিজের নিচে ঢাকা, আল্লাহতায়ালা তার ইজ্জত রেখেছেন। সূর্য তার পেছনে, ছায়া তার সামনে, মর্জিনার দেখতে সুবিধাই হয়। পাশেই দাঁড়ানো প্রহরীটার হাতে দুরবিন, সে বলে, ভাবি লন, দুরবিন দিয়া দেখেন। মর্জিনা দুরবিন দিয়ে বাচ্চাটাকে ক্লোজআপ করে দেখে, একটা মানুষের বাচ্চা, তার মানুষের মতো দুটো ছোট হাত, মানুষের মতো দুটো ছোট পা, মানুষের মতো তার নাক কান গলা মাথা মুখ, পেটের সঙ্গে নাড়ি, নাড়ির মাথায় লাল রঙের ফুল, মর্জিনার সমস্ত শরীর দুলে ওঠে, মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে, সে সেখানেই মাটির ওপরে পড়ে যায়। ওই জায়গায় ততক্ষণে ভিড়

www.amarboi.com

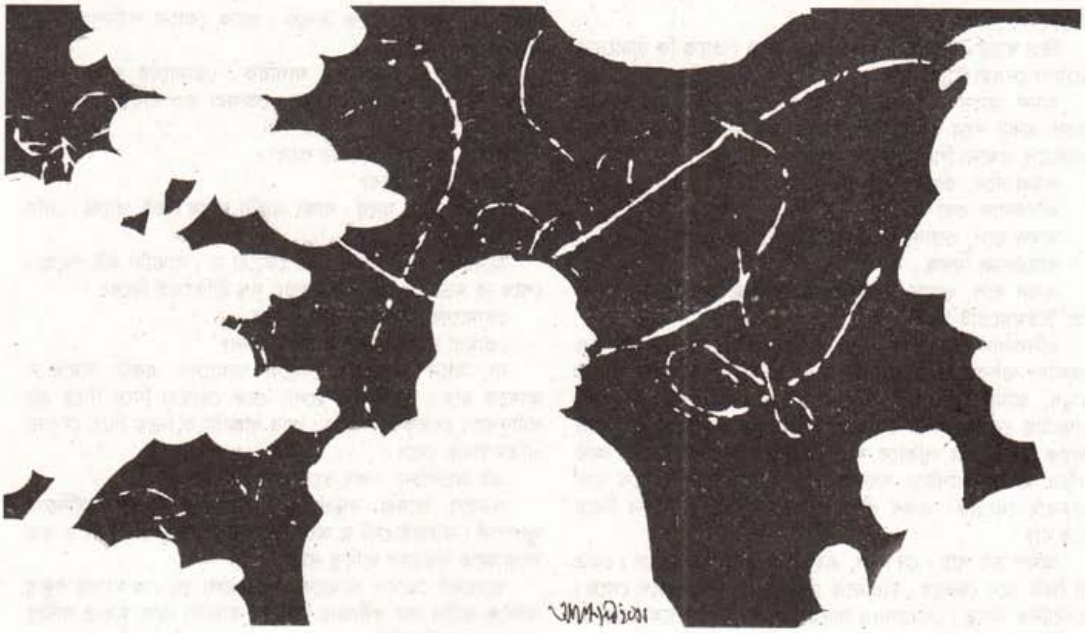

এই কে কাঁদে? কেউ কাঁদবে না

জমে গিয়েছিল, সীমান্তের উভয় পারেই, এই পারের ভিড়ের মধ্যে মহিলারাও ছিল, তারা বলে, ফিট হয়া গেইছে, পানির ছিটা দেওয়া খায়। কারও বগলত পানি আছে?

প্রহরীটার পিঠের ব্যাগে একটা পানির ফ্লাস্ক ছিল, সেই পানির ছিটা মর্জিনার চোখেমুখে দেওয়া হলে তার জ্ঞান ফিরে আসে, চোখ খুলে সে প্রথমেই বলে, তোমরা বাচ্চাটাকে আগে কোলে নাও। অতটুকুন বাচ্চা মাটিত পড়িয়া আছে। হায় হায় বাচ্চাটা এক ফোঁটা দুধও পায় নাই। উয়াকে তোমরা বাচান। মোর কথা তোমরা ভুলি যান। উয়াকে বাচান।

তখন অভিজ্ঞা মহিলারা বলে, আগত তো নাড়ি কাটা লাগিবে। তারপর না উয়াকে আনা যাইবে। হায় হায় রে অভাগী।

রসিকলাল নো ম্যান'স ল্যান্ডের ধারে সীমানারেখা বরাবর নলচেপাড়া অঞ্চলে বসে আছে স্তব্ধ। তার মুখে কোনো রা নাই। পরিমল মজুমদার চলে এসেছে। সে আফসোস করছে, এই ফটোকটা যদি মোক তুলিবার দিত, দেখবার পারতেন মুই কত বড় পুরস্কার জিতি যাইতাম। কমান্ডার মোর ক্যামেরা আটকেয়া থুইছে, আইজ অবধি যদি সেইটা ফেরত দেয়। মরা মায়ের পাশে জাস্ট বর্ন বেবি, এইটা কী যা তা ছবি। আর বাচ্চার মায়ের রঙিন পোশাক, ময়ূরের নীল, তার পাশে খালি গা বাচ্চাটার ফটোক কেমন আসিল চিন্তা করেন। বাসুদেব ধর ডাক্তার কাশি দেয়। ভয়াবহ শীত তাকে বড় যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে।

বিশু বলে, কায়ো যদিল ওই বাচ্চাটাক সরষার ত্যাল মাখিয়া দিবার চান, মোর দোকানের সরষার ত্যাল মুই মাগনা দেইম।

হাবিলদার মিজানের জরুরি মিটিং। বর্ডারে প্রহরা বাড়ানো হয়েছে। ভেতরে ভেতরে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির প্রস্তুতিও আছে। পার্শ্ববর্তী থানা সদরের প্রহরী আবাস থেকে অতিরিক্ত ফোর্স আসছে। সেসব নিয়ে সমস্যা নাই। আসল সমস্যা হলো, একটা ছোট্ট শিশু।

লম্বা ছাউনিঘরটায় মেঝেতে পাতা সারি সারি বিছানা। এর মধ্যে মিটিং করার কোনো চেয়ার-টেবিল নাই। বিছানাতেই উপস্থিত ৮ জন বসে আছে। কাদের মিয়া তাদের জন্য চা বানাচ্ছে পাকের ঘরে। হাবিলদার মিজান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছে। এই বাচ্চাটাকে আমরা কী করব?

নিজামুদ্দি বাবুর্চি বলে, আপনেরা যদি পারমিশন দেন, নলচেপাড়ার রক্ষীরা যদি আপত্তি না করে, বাচ্চাটারে আমিই নিয়া আসতে পারি। আমার বউয়ের কোলে তুইলা দিতে পারি। একটা মানুষের বাচ্চা ওইখানে মইরা পইড়া থাকব, এইটা তো একটা অমানুষিক কাজ হয়।

হাবিলদার মিজান বলে, ঘটনা এত সরল হইলে তো হইয়াই গেছিল। নলচেপাড়া পুশআউট করতে চায়। আমরা অদের পুশইন হইতে দেই না। কেন দিই না। অরা কয় মানুষগুলা এই পারের। আমরা কী কই, আমরা কই মানুষগুলা ওই পারের। এইটা তো অহনও সেটল হয় নাই। অহন যদি আমরা এই বাচ্চাটাকে নিয়া আহি, তাইলে অরা বলবে, তোমাগো বাচ্চা তোমরা তো লইবাই। কাজেই বাচ্চার মা চাচা কাকা ফুপা মেসো সবাইরে তোমগোই লইতে হইব। তখন তারা কইয়া বেড়াইব, হ্যাগো দাবি ন্যায্য, সেইটা সারা দুনিয়ারে তারা নাইচা নাইচা বইলা বেড়াইব। কী বুঝলা?

উপস্থিত প্রহরীরা মাথা নাড়ে। তাই তো। আমরা তো এত আগপাছ ভাইবা দেখি নাই। এই জন্যই লিডার হইল লিডার।

কাজেই ওই বাচ্চা আমরা আনতাছি না। অরা যদি নেয় তবে লইল।

নিজামুদ্দি মাথা চুলকায়। আর অরা যদি না লয়? তাইলে বাচ্চাটা কি ওইখানেই মরব? অহনও যে কুকুরে শিয়ালে বাচ্চাটারে লইয়া যায় নাই, এইটা কি বেশি না?

লইয়া গেলে তো মিটা যাইত। লয় নাই তো। দুর্ভাবনার অতলে ডুবে যেতে যেতে হাবিলদার মিজান বলে।

বাচ্চাটারে মুই নিয়া আসোম—বলে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে চায় মর্জিনা। তখন প্রহরী তাকে নিরস্ত করে। ভাবি, আগে হাবিলদার সাবে অর্ডার দিক। তারপরে। তার আগে আমরা কাউরেই নো-ম্যানস ল্যান্ডে পা দিতে দিতে পারি না। আর আপনেও পা রাখলেন, অরা যদি ফায়ার ওপেন করে, তাইলে আমগোও ফায়ার ওপেন করতে হইব। তাইলে পরিস্থিতি আর কন্ট্রোলে থাকব না। আশেপাশে বাড়িঘর আছে। সব রাইফেলের গুলির রেঞ্জে। এই এলাকার শান্তি তো বজায় রাখা দরকার।

রসিকলাল কোনো কথা বলে না। সে লঙ্গরখানাতেও যায় না। নো ম্যান'স ল্যান্ডের ধারে সে বসে আছে। এই বাচ্চাটার একটা সদ্গতি করুক আগে ওরা। বাচ্চার মার সৎকার করুক। তারপর সে রাঁধবে। তার আগে কোনো রকমের রান্নাবাড়ায় সে নাই। একটা মানুষ মারা গেল। মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নাই? কেন ওরা এইভাবে মানুষগুলানকে ঠেলে পাঠাতে গেল? আচ্ছা পাঠালই যখন, তখন ওই পারের মানুষেরা কেন এদের গ্রহণ করল না? বিশটা মুখ কি এতই বেশি? বিশটা মুখের অন্ন এই পৃথিবী

www.amarboi.com

সংস্থান করতে পারে না?

ভিড় বাড়ে। বাচ্চাটা এখনো বেঁচে আছে। তাকে কি বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত না?

অমল আসে রসিকলালের পাশে। সূর্য তখন পুব আকাশ থেকে একটু সরে একটু উঠে মধ্যগগনের দিকে যেতে চাইছে। দূর্বাঘাসে এখনো শিশির লেগে আছে।

অমল বলে, ওস্তাদ, রান্না কী হবে?

রসিকলাল কথা বলে না।

অমল বলে, ওস্তাদ, দুপুরে আজ খানা হবে না?

রসিকলাল নিস্তব্ধ।

অমল বলে, ওস্তাদ, কমান্ডার স্যারে কিন্তু রাগ করবে। খানা তো টাইমমতোই দিতে হবে।

রসিকলাল রেগে যায়। বলে, ভগবান জানে না, বাচ্চাটার দুধ দরকার? ভগবান কেন বাচ্চাটাকে দুধ দেয় না? তা হলে আমরা মানুষ, আমরা কেন ঠিক সময়ে খাবার দেব? স্যারকে বলো, বাচ্চাটার কোনো গতি না হলে রসিকলাল আর কোনো দিনও কারও জন্য খানা পাকাবে না। কোর্ট মার্শাল হলে হবে। আর পল্টুর মায়ের লাশটার সৎকার করতে হবে না? ওটাকে তো আমরাই মেরেছি। এখন ওটার লাশের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে না?

অমল ভয় পায়। সে বলে, এইভাবে বোলো না ওস্তাদ। কেউ না কেউ শুনে ফেলবে। চারদিকে লোকজনের ভিড় লেগে গেছে। সাংবাদিক আছে। গোয়েন্দাও আছে নিশ্চয়ই। তোমাকে ফায়ারিং কোর্ট মার্শালে নেবে।

অমলের পরনে একটা খাকি রঙের প্যান্ট, গায়ে একটা ফুলহাতা ফ্লানেলের শার্ট, কত দিন যে শার্টটা ধোয় না, রংটা বিবর্ণ, গন্ধটাও উৎকট। সে রসিকলালকে হাতে ধরে টানে। চলেন। ফাঁড়িতে চলেন। যা বলার কমান্ডারকে বলেন।

কমান্ডার এরই মধ্যে ওয়ারলেসে জেলা সদরের সাথে কথা বলেছে। জেলা সদর থেকে জানিয়েছে, এই বাচ্চা আর বাচ্চার মার দায়িত্ব তোমরা নিতে যেয়ো না। তোমাদের কাজ তোমরা করেছ। ওদের বর্ডার পার করে দিয়েছ। এখন যদি তোমরা ওই ডেডবডি কিংবা ওই বেবির দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নাও, তার একটাই মানে, তোমাদের সিটিজেনকে তোমরা বের করে দিয়েছ। সে ক্ষেত্রে খালি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের প্রশ্ন আসে না, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন দেখা দেয়, একটা প্রেগনান্ট মহিলাকে এই জুলুম কেন। এটা একটা মার্ডার কেস হয়ে যায়। এত বড় অপবাদ তোমরা কেন নিতে যাবে? জাস্ট ইগনোর।

পল্টুর মার শরীরটা পড়ে আছে। ঘাসের মধ্যে রক্ত শুকিয়ে গেছে। বাচ্চাটা এখনো নড়ছে। উভয় পারেই এলাকার মানুষ ভিড় জমায়। বারবার হুমকি ধমক দিয়েও উভয় পারের সীমানারক্ষীরা মানুষের ভিড় কমাতে পারে না।

নলচেপাড়া ফাঁড়ির কমান্ডারকে ঘিরে ধরেছে পরিমল মজুমদার, হোমিও চিকিৎসক বাসুদেব ধর, দোকানি বিশু, ভবেশ পাগলা এবং আরও অনেকে। তারা বলছে, আমরা কিছু বুঝি না, ওই লাশের সৎকার করতে হবে। আর বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে। বাচ্চাটার তো কোনো দোষ নাই।

হলদিবাড়ির হাবিলদার মিজানকেও ঘিরে ধরেছে গ্রামবাসী। এইটা কোন ধরনের অবিচার বাহে, আল্লার আরশ ভাঙি পড়িবে, আল্লার গজব পড়িবে, তোমরা কেমন লাশ ফেলায়া থোন আর তোমরা কেমন মাসুম বাচ্চটাকে বাঁচাইবার না দেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়। উভয় পক্ষই তখন ফ্লাগ মিটিং ডাকার কথা চিন্তা করে। মতলব হলো, এই পক্ষের বল যদি তারা ওই পক্ষের কোটে ঠেলে দিতে পারে।

দুপুরের আগেভাগেই পতাকা ওড়ে দু প্রান্তেই। টেবিল পাতা হয়। এ পারের দূত পত্র নিয়ে ওপারে, ওপারের দূত পত্র নিয়ে এপারে আসে। তখন, তারা, উভয় পক্ষের পছন্দনীয়, তেঁতুলতলায়, বৈঠকে বসে। তোমাদের একজন নাগরিক নো-ম্যানস ল্যান্ডে মরে পড়ে আছে। আর তার...

যে মরে পড়ে আছে সে আমাদের নাগরিক নয়।

আর তার পাশে একটা নিউ বর্ন বেবিও পড়ে আছে।

ওটা তোমাদের নাগরিকের বেবি। কাজেই তোমরা ওকে নিয়ে যেতে পারো। আমাদের কোনো আপত্তি নাই।

না, না। ও তো তোমাদের নাগরিক। এই পারে এসেছিল ইল্লিগালি। আমরা কাইন্ড এনাফ। তাকে কোনো পানিশমেন্ট না দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি।

না, না। ও তোমাদের নাগরিক। তোমাদের ভাষা বলে। তোমাদের ওখান থেকে এসেছে। তোমরা ওর দায়িত্ব নাও। ওর সৎকার করো।

না, না, তোমরা সৎকার করো।

বাচ্চাটার কী হবে?

তোমরা নিয়ে যাবে। বাচ্চা একটা মানুষ। কষ্ট পাচ্ছে। দেরি কোরো না।

আমরাও তা-ই বলি। দেরি কোরো না। বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে। শেষে না মরেটরে যায়। শিশুহত্যা সব রীতিতেই নিষেধ।

তোমাদের যা করার করতে হবে।

তোমরা দায়িত্ব এড়াতে চাইছ কেন?

না, মানে আজকের বৈঠকে আমাদের একটা সমাধানে আসতে হবে। সমাধানটা হলো, ওকে তোমরা নিয়ে গিয়ে ওর ধর্মানুসারে শেষকৃত্য করবে। আর বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে কোনো এতিমখানায় দেবে।

এই আলোচনা একই চক্রে চলতে থাকল।

আসলে আমরা বন্ধুপ্রতীম। আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। কাজেই সেটার অংশ হিসেবে তোমরা ওই মৃতা ও তার সদ্যোজাত সন্তানের দায়িত্ব নাও।

আসলেই তোমরা আমাদের খুব ভালো বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব আসলে কঠিন সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাচ্চাটা আর মৃতার দায়িত্ব তো তোমরা নিচ্ছই।

চা আসে। বিস্কুট আসে। দুই বর্ডার অবজারবেশন পোস্ট (বিওপি) পর্যায়ের ফ্লাগ মিটিং বলে কথা। চা শেষ হয়। সিগারেট জ্বলে। ধোঁয়া উদ্গীরিত হয়। কেবল দুই পক্ষের কেউই তালগাছটা ছাড়ে না।

সূর্য মধ্যগগন অতিক্রম করে। পশ্চিমে হেলতে থাকে। নিজামুদ্দি বাবুর্চি ভাতের চাউল ধোয়। ওই পারের মেহমানদের সে না খেয়ে যেতে দিতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত এই পতাকা বৈঠক নিষ্ফলভাবে শেষ হয়। হলদিবাড়ি বা নলচেপাড়া, এপার-ওপার, তাদের সম্মান, তাদের সঙ্গে জড়িত কোটি কোটি মানুষের মর্যাদার প্রশ্নে একটি মৃতদেহ এবং একটি শিশুর জীবন খুব মূল্যবান বলে কারও মনে হয় না।

মর্জিনা কিন্তু বসে থাকে না। সে জানে, ফুলবানু, পুবপাড়ার কিষাণ হামেদের বউ, তার বাচ্চাটা জন্মের এক মাসের মধ্যে মারা গেছে। সে ফুলবানুর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। ফুলবানুকে ঘটনা খুলে বলে। ফুলবানু ভাবে তাকে বুঝি বর্ডারে গিয়ে বাচ্চাটাকে তুলে নিতে হবে। তার আরও দুটি মেয়েসন্তান আছে (৩ ও ২)। আরও একটা মেয়েসন্তানের বোঝা সে নিতে পারবে না। মর্জিনা বলে, আরে তোমাকে ওই মাইয়াকে এটে কোনা আনা না লাগিবে, তোমাকেও বর্ডারত যাওয়া না লাগিবে। তোমরা খালি কী করিবেন, একটা মগত তোমার বুকের দুধ একনা ভরি দিমেন। মুই নিজে নিয়া যামো।

ফুলবানুর বুকে দুধের বান বয়ে যাচ্ছিল। দুধের চাপে সে দুধ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছিল। মর্জিনার কথায় সে রাজি হয়। একটা মগ বুকে ধরে স্তনে চাপ দিতেই ফিনকি দিয়ে দুধ বেরিয়ে মগ ভরিয়ে দেয়। এবার মর্জিনা বলে, বুবু, তোমার বাড়িত ফিডার আছে না। মোক একটা ফিডার ধার দেন। সাঁঝের আগতওই মুই হলদিবাড়ি বাজার থাকি একখান ফিডার কিনি নেইম, আর তোমারখান তোমাক পাঠেয়া দিম। ফুলবানু দয়াবশত ফিডারটা মর্জিনার হাতে তুলে দেয়। মর্জিনা ফিডারে দুধ নিয়ে ছুটতে থাকে ফাঁড়ির দিকে। দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই পৌঁছে যেতে হবে সেখানে।

রসিকলালও, নলচেপাড়ায়, চুপচাপ বসে নাই। সে হোমিও চিকিৎসক বাসুদেব ধরের সঙ্গে পরামর্শ করে, কী করে বাচ্চাটার নাড়ি কাটা যায়। বাসুদেব ধর বলে, নাড়ি তো মুইও এই জীবনে কম কাটোম নাই। কিন্তুক সমস্যা হইলে নো-ম্যানস ল্যান্ডত কাঁয় যাইবে। যে টেনশন, এক পা বাড়াইলেই না গুলি করিয়া দেয়। এ পাক থাকিয়াও গুলি করিবার পারে, ও পাক থাকিয়াও করিবার পারে। মোর প্রাণটা না অপঘাতে যায়। এক কাজ যদিল করিবার পারেন তাইলে হয়। বাচ্চাটাকে কোনোমতে নো-ম্যানস ল্যান্ড থাকিয়া যদি এই পারের লাইনত আনিয়া থুবার পারেন, তাইলে

www.amarboi.com

মনে করেন, আর কিছু না লাগিবে, মুই ঘচাৎ করিয়া নাড়ি কাটিয়া দিবার পারিম।

তা তো আপনি পারবেনই, কিন্তু এখন কী করতে পারবেন তাই বলুন।

কিছুই করিবার না পারিমো।

রসিকলাল হতাশ হয়।

সে ভাবতে বসে। ওই বাচ্চাকে নলচেপাড়ায় আনা যাবে না। আবার কেউ নো ম্যান'স ল্যান্ডে ঢুকতেও পারবে না। না নলচেপাড়ার কেউ, না হলদিবাড়ির কেউ। তাইলে বাচ্চাটার কী দশা হবে?

নলচেপাড়ায় যদি এমন কেউ থাকত, একজন মহিলা, যার বাচ্চা মারা গেছে, তাহলে ওই মাকে আমরা নো-ম্যানস লান্ডে পাঠিয়ে দিতে পারতাম, কী বলেন ডাক্তার বাবু।

হ। তাক তো একটা বুদ্ধি হয়। কিন্তুক মহিলা অটেকোনা নো-ম্যানস ল্যান্ডত কেমনে থাকিবে। নো-ম্যানস ল্যান্ডত কোনো ঘরবাড়ি বানান যায় না। তাইলে উপায়?

রসিকলাল আশা ছাড়ে না। আকাশের দিকে তাকায়। পাখিরা কী স্বাধীন। সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে যখন তখন। পাখিরা পারে। তবে, গরু পারে না। গরু নিয়া ম্যালা কাজিয়া হইছে দুই পারের মধ্যে।

আর কে পারে। আর কী পারে?

সে প্রার্থনায় বসে। হে ভগবান, এটা উপায় দাও ভগবান।

দুধের ফিডার নিয়ে মর্জিনা চলে আসে সীমানা খুঁটির কাছে। ওই তো বাচ্চাটা। তাকে দুধটা কে দিয়ে আসে এখন? ভাবি, কী আনছেন। দুধ? আনাই সার। লইয়া তো বাচ্চার কাছে যাওন যাইব না। এক ভিতরে গেছেন তো মনে করেন গুলি আরম্ভ হইয়া যাইব। প্রহরী তাকে সাবধান করে দেয়।

তখন, ওই দূর্বাঢাকা জায়গায়, পশ্চিম দিকে মুখ করে মর্জিনা নফল নামাজ পড়তে আরম্ভ করে। দুই রাকাত নফল নামাজ সে ঘাসের গালিচায় বসেই পড়ে ফেলে। এই বার সে মোনাজাতে বসে, হে আল্লাহ, এই মাসুম বাচ্চাটার একটা উপায় করো রহমানুর রহিম।

রসিকলাল আরোগ্য নিকেতনের বেঞ্চে বসে প্রার্থনা করছে, তার সমস্ত মনোযোগ প্রার্থনায়, কিন্তু তার মনঃসংযোগে চিড় ধরে, ডুগডুগির শব্দ যখন তার কানে আসে সে চোখ খোলে। দেখতে পায় একটা বাঁদরওয়ালা। সে ডুগডুগি বাজাচ্ছে। তার ঘাড়ে উঠে বসে আছে একট বাঁদর। বাঁদরটার গায়ে একটা নীল রঙের জামা। পরনে একটা লাল রঙের স্কার্ট। বান্দরওয়ালার পেছনে রাজ্যের ছেলেমেয়ে। 'বান্দর তোর টিকনা লাল', 'ওই বান্দর তো টিকনা লাল' করে ছেলেপুলে বাঁদরটাকে খেপায়।

বাঁদরওয়ালা আরোগ্য নিকেতনের সামনে এসে বলে, নমস্কার বাবু। বান্দরের খেলা দেখিবেন নাকি বাবু। বান্দর সব পারে। দেখিমেন, কেমন করিয়া মাইয়ার বিয়াও দিয়া মায়ে কান্দে। কেমন করিয়া নতুন বউ ঘোমটা দেয়। কেমন করিয়া জামাই নয়া বউক আদর করে। কেমন করিয়া ইস্কুলের ছাত্র বই বগলে ইস্কুলে যায়। কেমন করিয়া স্বামী মরি গেলে বিধবা বউয়ে কান্দে। কেমন করিয়া ফুটবল খেলে। কেমন করিয়া ডিগবাজি খাইতে হয়।

রসিকলাল আগ্রহ ভরে শোনে। ডাক্তার বাসুদেব ধর একটা আধুলি বের করে ধরে বলে, এলা আর না জ্বালায়েন বাহে। তোমরা যান তো। ধরেন। পাইসা ধরেন।

বান্দরওয়ালা বলে, যা রানি। বাবুকে নমস্কার দিয়া পাইসাটা নিয়া আয়।

রানি সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য নিকেতনে ঢুকে পড়ে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বাসুদেবকে। তারপর তার হাত থেকে আধুলিটা নিয়ে বান্দরওয়ালার ঘাড়ে উঠে তার পকেটে ঢুকিয়ে দেয়।

রসিকলাল বলে, বান্দরওয়ালা সাব, রানি তোমার সব কথা বোঝে?

সব কথা বোঝে না। সব কথা বুঝলে ওকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করায়া দিতাম। তবে অনেক কথাই বোঝে বাবু।

ধরো তুমি বললে, ওই বাচ্চাটাকে কোলে করে আন। এনে দেবে?

তা পারিবে বাবু। এইসব কথা বুঝে। বান্দর হইলেও তো মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে। মগজ আছে।

বান্দরটাকে অর্ডার দাও দেখি, কী করতে পারে দেখি।

বাবু, দশটা রুপিয়া দেন। আমি ওকে যা বলছি ও শুনবে।

রসিকলাল পকেট থেকে ৫ টাকার একটা মুদ্রা বের করে। আগে ওকে কিছু দেখাতে বলো। এই যে পয়সা, দেব।

বান্দরওয়ালা ডুগডুগি বাজায়। রানি, দেখেয়া দেও তো, বর মরি গেলে বউ কেমন করিয়া কান্নাকাটি করে!

বাঁদরটি অমনি মাটিতে বসে মাথা চাপড়ায়। তারপর গড়াগড়ি যায়।

বাচ্চা লোগ তালিয়া বাজাও। বাচ্চারা সব ঘিরে ধরেছে ওই বাঁদর আর বাঁদরওয়ালাকে আরোগ্য নিকেতনের দরজার সামনে। রসিকলাল চোখ বড় বড় করে দেখে। বাচ্চারা একযোগে হাততালি দিয়ে ওঠে।

এবার দেখাও, বাচ্চারা কেমন করে বই বগলে ইস্কুলে যায়।

বাঁদরটি বাঁদরওয়ালার ঝোলা থেকে বই বের করে। তারপর সেটা বগলে নিয়ে হাঁটতে থাকে।

আর মাস্টার মশাই কী করে?

বাঁদরটি এবার বাঁদরওয়ালার কাঁধে উঠে তার চশমা খুলে নেয়। তারপর সেই চশমা নিজের চোখে পরে। তারপর লাফিয়ে নামে মাটিতে। একটা বেত সে বের করে ঝোলা থেকে। বেত হাতে সে পণ্ডিতমশাইয়ের ভঙ্গি করতে থাকলে বালকবালিকার দল হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

রসিকলাল বাসুদেবকে জড়িয়ে ধরে। ডাক্তার বাবু, আমার প্রার্থনা ভগবান মঞ্জুর করেছেন। নিন। আপনার ছুরি কাঁচি নিন। আপনাকে এখন নাড়ি কাটতে হবে।

রসিকলাল বাঁদরওয়ালার কাছে যায়। তাকে বলে, বান্দরওয়ালা দাদা, তোমার নাম কী হবে?

আমার নাম কাঞ্জিলাল আছে বাবু।

তোমাকে একটা বাচ্চার জীবন বাঁচাতে হবে। আসো। তোমার রানিকে নিয়ে আসো।

ড. বাসুদেব ধর একটা ব্লেড কেনে বিশুর দোকান থেকে। স্পিরিট তার দোকানেই প্রচুর আছে। তারা, বাঁদরওয়ালা কাঞ্জিলাল, রসিকলাল, বাসুদেব আর রানি, নো ম্যান'স ল্যান্ডের কাছে গিয়ে হাজির হন। রক্ষীরা সঙ্গিন হাতে সদা প্রস্তুত। ওই পারেও। ওই পারে তখনো মর্জিনা মোনাজাতরত।

রসিকলাল বলে, রানি ওই মহিলার কাছে যাবে। ওইখানে একটা বাচ্চালোগ পড়ে আছে। তাকে নিয়ে আসবে। ডাক্তার সাবের কাছে দেবে। ডাক্তার সাব তার নাড়ি কাটবে। পারবে তোমার রানি?

পারিবে বাবু।

কাঞ্জিলাল ডুগডুগি বাজায়। যাও রানি। উই ওখান থাকিয়া বাচ্চালোগ ধরিয়া আনো। কোলে করিয়া। মা যেমন বাচ্চাকে কোলে করিয়া আনে।

রানি ছুটে যাচ্ছে। দু পায়ে যায়। চার পায়ে লাফ দেয়। পল্টুর মা আর তার সন্তানের কাছে পৌঁছাতে তার লাগে দু মিনিট। তারপর এদিক-ওদিক সে দেখে। বাচ্চাটাকে কেন্দ্র করে ঘোরে। পল্টুর মার হাত নেড়ে দেখে। তারপর বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে এক হাতে ধরে তিন পায়ে চলে আসে সোজা এই পারে। বাচ্চার সঙ্গে তার নাড়ি ফুলসমেত ঝুলে থাকে।

রক্ষীরা চেয়ে দেখে। বাঁদর সীমানা অতিক্রম করলে কী বিধান, তারা ভাবতে থাকে।

কাঞ্জিলালের কোলে বাচ্চাটা। রসিকলালের চোখে অশ্রু। সে হাউমাউ করে কাঁদছে। বাসুদেব বাচ্চার শরীরের সঙ্গে ঝুলে থাকা মাতৃশরীরের শেষ চিহ্নটা কেটে ফেলে দেন ওই নো ম্যান'স ল্যান্ডেই। ওইখানেই তার নাড়ি থাকুক। নাড়ির বাকি অংশ পেঁচিয়ে দেন বাসুদেব। স্পিরিট দিয়ে জায়গাটাকে মুছে দেন।

মর্জিনা চোখ খুলে সব দেখে। সে বলে, ভাই, ওদের বলেন, আমার কাছে দুধ আছে। মায়ের বুকের দুধ। বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে দিক।

প্রহরী তার হ্যান্ডমাইকে আবেদন জানায়, বাচ্চাটাকে পাঠাইয়া দিন। এইখানে মায়ের বুকের দুগ্ধ আছে।

কাঞ্জিলাল বাচ্চাটাকে রানির কোলে তুলে দেয়। রানিকে বুঝিয়ে দেয় বাচ্চাটাকে সীমানার ওই পারে নিয়ে যাওয়ার আদেশটা। রানি বাচ্চাটাকে নিয়ে সোজা চলে যায় পল্টুর মার কাছে। সেখানে সে বাচ্চাটাকে আবার শোওয়ায়। তারপর কয়েক লাফে চলে যায় মর্জিনার সামনে। এক ছোবলে দুধের ফিডারটা হাতে নিয়ে সে তিন পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে আসে পল্টুর মার

www.amarboi.com

শরীরের কাছে। বাচ্চাটাকে মানুষ মায়ের মতোই কোলে নেয়। আর ফিডারের দুধ বাচ্চার মুখে ধরে। আনন্দে ভয়ে উত্তেজনায় মর্জিনার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। রসিকলাল কাঁদে সশব্দে। হাউমাউ করে। তখন ব্যর্থ ফ্লাগ মিটিং শেষ করে কমান্ডার আর তার সহযোগী প্রতিনিধিরা ফিরে আসছে হলদিবাড়ি থেকে নলচেপাড়ায়। রসিকলাল কাঁদছে। সে কান্না থামাতে পারছে না। আরেক পারে মর্জিনা আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর জানাচ্ছে।

সময় গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যা নামে। রানি বাচ্চাটাকে কোলে করে ধরে রাখে। আকাশে হলুদ আলো। এখন কুয়াশাটা কম। আকাশে কয়েক টুকরা রঙিন মেঘ। বিচিত্র তাদের রং আর আকার। রানির লেজের মধ্যে অস্তরাগ।

কাঞ্জিলাল ডাকে, রানি চলিয়া আইসো। সে ডুগডুগি বাজায়। রানি আসে না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে যেন নামছে শীত। রানি বাচ্চাটাকে তার রোমশ বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখে।

রাত হয়। রানি আর ওই জায়গা থেকে নড়ে না। রসিকলাল বাবুর্চি বলে, অমল, তুমি আজকের রান্নাটা সামলাও। আমি দেখি ঘটনা কী ঘটে।

মর্জিনাও প্রহরীদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখে রানির কাণ্ড।

রসিকলাল বলে, রানিরও তো ঠান্ডা লাগবে। বাচ্চাটারও লাগতে পারে। আমার কাছে কম্বল আছে। রানিরে দেই।

কাঞ্জিলাল বলে, ইয়ার মানে কী! রানি কি সারা রাত এইখানে থাকিয়া যাইবে।

রসিকলাল বলে, থাকলেই তো ভালো।

কাঞ্জিলাল বলে, আমার একমাত্র উজি ওজগারের পথ বন্ধ করিয়া দিবেন? হামাকে না খিলাইয়া মারিবার বুদ্ধি?

রসিকলাল বলে, তোমার ওই বাঁদরের দাম কত?

কাঞ্জিলাল বলে, এক লাখ রুপি দিলেও মুই ওই বান্দরক না বেচিম। পুবপারের বান্দর। কিন্তু কথা কেমন শুনে সেইটা দেখছেন? এই রকম হুকুম মানা বান্দর মুই আর কই পাইম। কাঁয় মোকে ট্রেনিং পাওয়া বান্দর আনি দিবে? মুই বালবাচ্চাসহ না খায়া মরিয়া যাইম।

রসিকলাল বলে, আরে আজকের রাতটা থাকুক না। কাল আবার তোমার বান্দর তোমার হবে। আজ খেল দেখিয়ে কত পেতে? সেটা নাও। আমরা দেব।

রসিকলাল, পরিমল মজুমদার, বাসুদেব ধর, বিশু সবাই মিলে কাঞ্জিলালকে ৪০ রুপি দেয়।

রসিকলাল ফাঁড়ির দিকে দৌড় ধরে। ফাঁড়িতে তার নিজের দুটো কম্বল বরাদ্দ। সে একটা কম্বল নিয়ে দৌড়ে আসে নো ম্যান'স ল্যান্ডের ধারে। তার হাতে একটা টর্চলাইট। সেটা কাঞ্জিলালের হাতে দিয়ে রসিকলাল বলে, রানিকে ডাকো।

তখন কাঞ্জিলাল বলে, রানি, আসিয়া পড়ো। কম্বলটা ধরি যাও। সে কম্বল দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে রানিকে দেখায়। তিন তিনটা টর্চলাইট বিশু, রসিকলাল আর বাসুদেব কাঞ্জিলালের দিকে তাক করে। সেই আলোয় রানির পুরো প্রদর্শনীটা দেখতে পায়। ডুগডুগির শব্দও শুনতে পায়। সে বাচ্চাটাকে রেখে সীমানা খুঁটির কাছে আসে। কম্বলটা এক ছোঁয়ে নিয়ে আবার চলে যায় বাচ্চাটার কাছে। কম্বলটা সে নিজের মাথার ওপরে ঘোমটার মতো করে ধরে। কম্বলসহ রানিকে একটা তাঁবুর মতো লাগে। তিনটা টর্চলাইটের আলোয় ১৫০ গজ দূর থেকে ওরা সেই দৃশ্য দেখে। তারপর তারা নিজ নিজ গৃহে চলে যায়।

মর্জিনা অনেক রাত পর্যন্ত এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল প্রহরীদের পাশে। নিজামুদ্দি বাবুর্চি আসে। বলে, এতক্ষণ খাড়ায়া কী দ্যাহো?

মর্জিনা বলে, বান্দরের মানষামি দেখি। মানষে করে বান্দরের কাম, আর বান্দর করে মানষের কাম। আজকা আইতের মতো আর চিন্তা করিবার কিছু দেখি না। কাইল সকাল সকাল দুধ ধরিয়া আসমো ফুলবানুর কাছ থাকিয়া।

শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে, দাঁতে দাঁতে খটখট শব্দ তুলে মর্জিনা আর নিজামুদ্দি বাড়িতে ফিরে আসে। মর্জিনা বাড়িতে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে খাটিয়ায় বসে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। ল্যাম্পোর আলো সেই কম্পমান শরীরটাকে আরও এলোমেলো করে দেয়। নিজামুদ্দি মর্জিনাকে জড়িয়ে ধরে বলে, দেখো, তোমার কোলে বাচ্চা আইব। ফুটফুটা বাচ্চা। কাইন্দো না।

পল্টুর মার দেহখানি ওই নো ম্যান'স ল্যান্ডেই পড়ে থাকে কয়েক দিন। প্রচণ্ড শীতে দেহখানি অবিকৃতই থাকে। কিন্তু বাচ্চাটার দায়িত্ব একজন যথার্থ মায়ের মতোই পালন করে চলে রানি। রোজ সকালে আর বিকেলে মর্জিনা তার জন্য ফিডার নিয়ে আসে, রানি দৌড়ে সেই ফিডার সংগ্রহ করে রানিকে কোলে করে খাইয়ে দেয় পুরো দুধটাই। রসিকলাল, বিশু, বাসুদেব রানির খাবার পাঠায় পালা করে। কলা, ফুল, নানা ধরনের ফল, পাতা, নারকেল, বাদাম, এমনকি ভাত রুটি বিস্কুট। পোকামাকড় সে নিজেই ধরে ধরে খায়। তাকে দিতে হয় না। ভুট্টা পেলে খুবই খুশি হয়। মুলা, গাজর, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি। কমলা পর্যন্ত খায়। তার খাওয়া দেখতে, তার কাণ্ডকারখানা দেখতে রোজ হাজির হয় ছেলেপুলেরা। দুই পারেই।

তিন দিনের মাথায় খুব কুয়াশা পড়ে। এমন কুয়াশা যে কিছুই আর দেখা যায় না। রানিকে না, বাচ্চাটাকে না। খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে রসিকলাল, বাসুদেব, বিশু।

সকালবেলা, নিজের ঘরের কাজ দ্রুত সেরে ফেলে, মর্জিনা সেই কুয়াশা চিরে চিরে হাজির হয় ফুলবানুর বাড়িতে। আলপথে হাঁটতে তার অসুবিধা হয়, কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কোনটা আল, কোনটা চষাখেত, কোনটা নালা। ভেজা ঘাসে তার পা ভিজে যায়, তার স্যান্ডেলের তলা ঘাসে, মাটিতে, খড়ে পুরু হয়ে যায়। এক রকম অভ্যাসবশতই সে ফুলবানুর ঘরে এসে পৌঁছায়। ফুলবানু, বুবু, তোমরা কোটে? মুই মর্জিনা।

মর্জিনার কণ্ঠস্বর শোনামাত্র ফুলবানুর বুকে দুধের চাপ ওঠে, সে তার দুই বাচ্চাকে তখন ভাতভাজি খাওয়াচ্ছিল, একনা খাড়ান বুবু, এই মুই হাতটা খালি আজার করি ন্যাও, বলে বাচ্চাদুটোর মুখে ভাত ঠেসে ধরে সে তাড়াতাড়ি মগটা হাতে নেয়। উলের ব্লাউজ খুলে স্তনের বোঁটায় মগ ধরে সে ভাবতে থাকে তার সদ্য মারা যাওয়া সন্তানটার কথা, ছেলে বাচ্চা ছিল, নাম রাখা হয়েছিল সাচ্চু, গায়ের রং হয়েছিল টকটকে, মুখখানা ছিল হাসি হাসি, মুখ থেকে আসত বেহেশতের সুঘ্রাণ, ভাবতেই দুধের নহর এসে ভরে ফেলে মগটা। মর্জিনা ফুলবানুর রান্নাঘরে ঢুকে সেই মগটা নিয়ে কুয়াশার মধ্যে অন্তর্হিত হয়। কুয়াশার মধ্যেই আঙিনায় দাঁড়িয়ে মর্জিনা ফিডারে দুধটুকুন ভরে নেয়, তারপর মগটা ফিরিয়ে দিয়ে মুই আসোম বুবু বলে সে ছুটতে থাকে না-মানুষি জমিন অভিমুখে। ওইখানে, এই ঘন কুয়াশার মধ্যে, রানির কোলে কম্বলের নিচে আরও একটা মানবশিশু অপেক্ষা করছে এই দুধের জন্য। কুয়াশায় পথ চিরে চিরে লাল শাড়ি পরা মর্জিনা এসে দাঁড়ায় নো ম্যান'স ল্যান্ডের কিনারে।

দুধের ফিডার হাতে কুয়াশার মধ্যে উদ্বিগ্ন দাঁড়িয়ে থাকে মর্জিনাও। কিছুই দেখা যায় না। এখন রানি কীভাবে আসবে, আর কীভাবে তার হাত থেকে ফিডার নিয়ে যাবে? এত দিন রানি তাকে দেখেছে ফিডার হাতে, দেখা মাত্রই চার পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এসেছে, হাতে ফিডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার লাফিয়ে চলে গেছে বাচ্চাটার কাছে, কিন্তু আজ? আজ যে কুয়াশা সবকিছু ঢেকে ফেলেছে। কোনো কিছুই দৃশ্যমান নয়। মর্জিনা খানিকক্ষণ কুয়াশায় দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে, আনি, আনি। কিন্তু সেই ডাক কুয়াশার ওপরে ভেসে থাকে যেন, বোধ করি রানির কানে পৌঁছয় না। মর্জিনা প্রমাদ গোনে। আহা বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে। সারা রাত এক ফোঁটা দুধও সে পায় নাই। মা বেঁচে থাকলে সারা রাত সে থাকত মায়ের ওমে, বুকের সঙ্গে লেপ্টে, কতবার যে সে মায়ের বুক হাতড়ে স্তন্য পান করত। তার মাথার ওপরে একটা ছাদ নাই, তার মায়ের কোল নাই, তার মাতৃস্তন নাই, তার কোনো দেশ নাই, পরিচয় নাই। মর্জিনার বুকের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়, তার দুচোখ গলে আসতে চায়, সে দুধের ফিডার হাতে নো ম্যান'স ল্যান্ড ধরে হেঁটে যায় সেখানে, যেখানে পল্টুর মা শুয়ে আছে, যেখানে রানি নামের বাঁদরটির কোলে একটা মানবশিশু। সে খানিকক্ষণ কুয়াশার মধ্যে পথহারা হয়ে ঘোরে, তখন তার কানে আসে শিশুর কান্নার আওয়াজ, শব্দের উৎস সন্ধান করে সে ঠিকই পৌঁছে যায় রানি আর বাচ্চাটার কাছে। সে ভাবে সে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে নিজেই দুধটুকু খাইয়ে দেবে, সে রানির দিকে দু হাত বাড়ায় বাচ্চাটাকে নেবার জন্য, রানি এক হাতে বাচ্চাটাকে ধরে আরেক হাতে সরিয়ে দেয় মর্জিনার বাড়ানো হাত। তখন মর্জিনা রানির হাতে ফিডারটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কুয়াশায় খুব ভালো দেখা যায় না, তবু রানির কোলে বাচ্চা, বাচ্চার মুখে ফিডারের নিপল ধরা, বাচ্চাটা একমনে দুধ টানছে, মর্জিনা সেই দৃশ্যটা অবলোকন করে, তার বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে।

www.amarboi.com

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মর্জিনার হুঁশ হয়, সে একেবারে জিরো লাইনে এসে পড়েছে, আর তার পরনে লাল শাড়ি, হঠাৎ করে সূর্য উঠে পড়লে নলচেপাড়া বা হলদিবাড়ি যেকোনো পার থেকেই গুলি হতে পারে, তাহলে শুধু সেই মরবে না, গোলাগুলি লেগে গিয়ে আশপাশের জনবসতির সব মানুষের জন্যই সে বিপদ ডেকে আনবে। মর্জিনা অকুস্থল ত্যাগ করে নিজের বাড়ি ফিরে যায়।

রোদ ওঠে পরের দিন বিকেলে। তখন সবকিছু আবার পরিষ্কার। তখন দেখা যায়, পল্টুর মার দেহটা আর ওই জায়গায় নাই। কে তাকে নিয়ে কোথায় গিয়েছে, শেয়ালে কুকুরে টেনে নিয়ে গেছে, নাকি কোনো মানুষ, নাকি এ জিন ভূতের কাণ্ড, কেউ সেই রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি। অবশ্য উদ্ধারের চেষ্টা যে খুব হয়েছে, তাও নয়।

রসিকলাল আর নিজামুদ্দি, দুপারের ফাঁড়ির দুই বাবুর্চি একই কাজ করে। সকাল থেকে যে জনতা রানির কাণ্ডকারখানা দেখতে আসে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করে। ভবেশ পাগলা এক পারে, আর মজনু দেওয়ান আরেক পারে এই কাজে নিয়োজিত হয়। দেখতে এলেই দুই টাকা বাধ্যতামূলক। দিতেই হবে। দিনে ৪০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত আয় হয় এক পারে। দুপার মিলে সেটা দাঁড়ায় ২০০ টাকা পর্যন্ত। টাকাটা ওরা তুলে তুলে রানির হাতেই দেয়। রানিও প্রণাম করে সালাম করে সেই টাকা গ্রহণ করে। তারপর বিকেলবেলা সেই টাকা তুলে দেওয়া হয় কাঞ্জিলালের হাতে। কাঞ্জিলাল সেখান থেকে ৮০ টাকা নেয়। বাকি টাকা রেখে দেওয়া হয় সীমানার কল্যাণ তহবিলে।

দুই সীমানা ফাঁড়ির রক্ষী ও প্রহরীরা মাঝেমধ্যে ফ্লাগ মিটিংয়ে বসে। কত টাকা চাঁদা উঠল, কত টাকা আছে, আর কত টাকা দরকার, এইসব নিয়ে আলোচনাটা ওঠে সব আলোচনার শেষে। কিন্তু সেই আলোচনাই হয় সবচেয়ে প্রাণবন্ত আর সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত। নো ম্যান'স ল্যান্ডে কোনো স্থাপনা বানানো যায় না, এটাই নিয়ম। এখন তো ঝড়বৃষ্টি নাই, কম্বলের নিচে খড়কুটোর বিছানায় ভালোই আছে রানি আর সীমানা। কিন্তু বৃষ্টির দিনে কী হবে। স্থায়ী স্থাপনা বানানো যাবে না, কিন্তু প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি একটা অস্থায়ী কিছু তো থাকতেই পারে, উভয়েই একমত হয়। একদিন একটা ছইয়ের মতো ঘর, ভেতরে পলিথিন মোড়ানো, এমনকি নিচেও পলিথিন, যাতে কিছুতেই বৃষ্টির পানি না ঢুকতে পারে, এমন একটা জিনিস ওই নো ম্যান'স ল্যান্ডে কে বা কারা কুয়াশার আড়ালে গিয়ে রেখে আসে। রানিও এমন একটা আবাস পেয়ে ভেতরে আশ্রয় নিতে কার্পণ্য করে না।

'সীমানা'র নামকরণটা ফ্লাগ মিটিংয়েই পাস করা হয়। একজন অবশ্য চেয়েছিল নাম রাখা হোক মৈত্রী, তবে সেটা উচ্চারণে কঠিন এই অজুহাতে

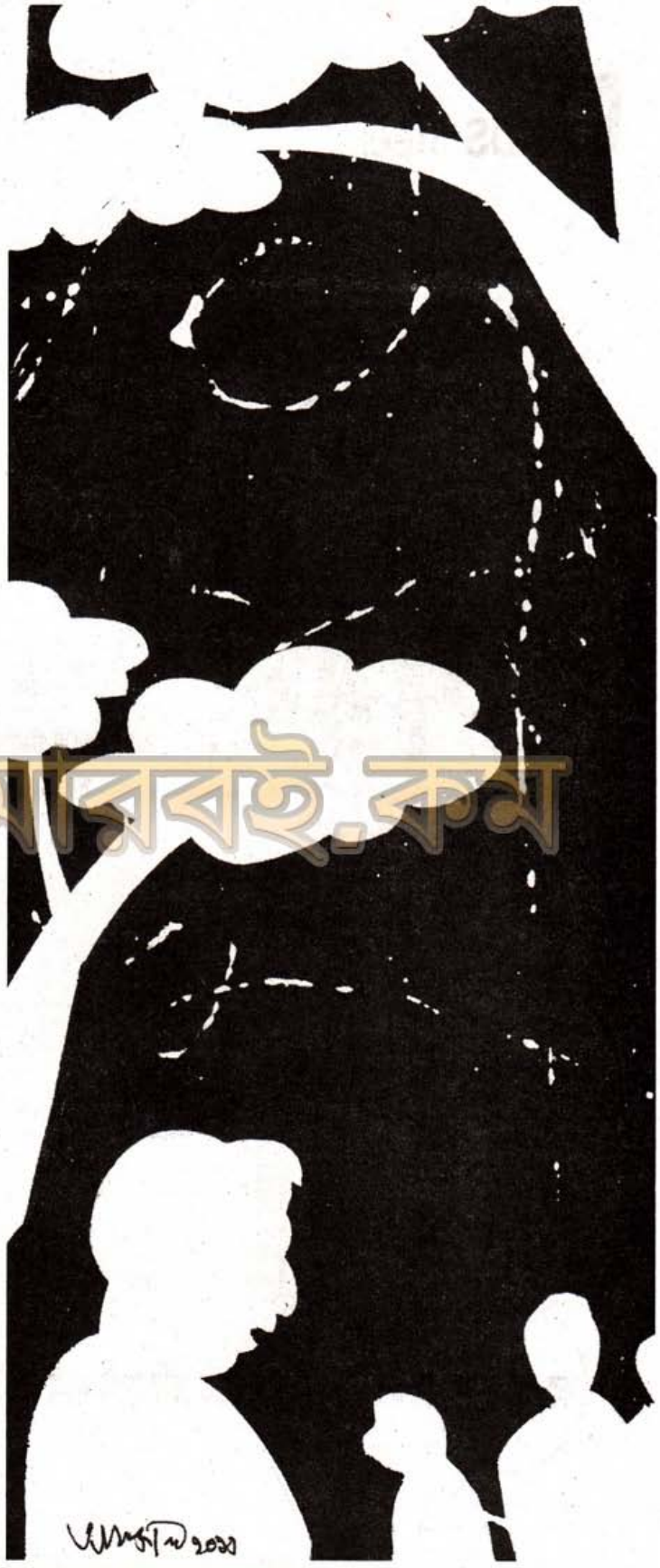

যাও, রানি। উই ওখান থাকিয়া বাচ্চালোগ ধরিয়া আনো

আমারবই.কম

www.amarboi.com

বাতিল হয়ে যায়। আসলে সীমানা নামকরণটা পরিমল মজুমদারের, সে-ই কমান্ডারের মাথায় নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওদিকে মর্জিনারও সীমানা নামটা পছন্দ, কারণ মর্জিনার সঙ্গে সীমানা কথাটার ধ্বনিগত মিল আছে। সেদিক থেকে সেও নিজামুদ্দির মাধ্যমে চেষ্টা করেছে যাতে সীমানা নামটা হাবিলদার মিজানের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফ্লাগ মিটিংয়ে উভয় পক্ষ থেকে সীমানা নামটাই প্রস্তাবিত হলে উভয় পক্ষই তাতে সম্মত হয়। নামকরণ উপলক্ষে হলদিবাড়িওয়ালা একটা খাসি কুরবানি দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। এটাকে তারা আকিকা বলে। মাংস কাটা হলে তার ভাগ নলচেপাড়া ফাঁড়িতেও পৌঁছয়। রসিকলাল বেশি করে মসলা দিয়ে সেই মাংস রান্না করে। নিজামুদ্দিরও সেই মাংস রান্নায় উৎসাহের কোনো কমতি থাকে না। গরম ভাত দিয়ে শীতের দুপুরে গরম মাংসের ঝোল খেতে প্রহরীরা বড়ই পছন্দ করে। মজনু দেওয়ানও সেই খানার ভাগ পায়। যেমন ওই পারে বিশু আর ভবেশ পাগলা মাংস-রুটির বখরা থেকে বঞ্চিত হয় না। ডাক্তার বাসুদেব ধর নিরামিষাশি। সেটা রসিকলাল জানত বলেই তাকে আর তরকারির বাটি পাঠাতে হয় না।

প্রথম চার মাস সীমানা কেবল ফুলবানুর দুধ খেয়েই বড় হতে থাকে। তারপর একদিন নলচেপাড়া ফাঁড়ি থেকেই প্রস্তাব আসে, সীমানা ওরফে সীমুর অন্নপ্রাসন করা হবে। হলদিবাড়ির ফাঁড়ি তাতে সম্মতি জানায়। রসিকলাল বাচ্চার জন্য জাউভাত আর সকলের জন্য পোলাও কোর্মা রান্না করে। রানিকে দেখতে আসা মানুষদের কাছ থেকে এ উপলক্ষে ৫ টাকা করে চাঁদা সংগ্রহ করা হয় এক সপ্তাহ ধরে। যে অতিরিক্ত টাকা সংগৃহীত হয়, তা দিয়েই রসিকলাল ও অমল এই উন্নত মানের ভোজের আয়োজন করে। খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় হলদিবাড়ির ফাঁড়িতেও। ভবেশ পাগলা খাবার নিয়ে শূন্যরেখা বরাবর গিয়ে মজনু পাগলার হাতে তুলে দেয়। মজনু পাগলা সেই খাবার নিয়ে 'হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, পোলাও-কোর্মা আসিয়া পড়ছে' বলে চিৎকার করতে করতে প্রহরীদের ফাঁড়িতে নিজামুদ্দি বাবুর্চির কাছে পৌঁছে দেয়। নিজামুদ্দি সেই খাবার থেকে এক থালা মজনু পাগলাকে দেয়, আর একটা থালায় করে মর্জিনার জন্যে খানিকটা তুলে রাখে, আরেকটা থালায় সে খাবার সরিয়ে রাখে ফুলবানুর জন্য। মর্জিনা আর ফুলবানুর অধিকার আছে সীমুর অন্নপ্রাসনের খাদ্যের ভাগ পাবার। সীমুর মুখে ভাত তুলে দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতাটা অবশ্য দুই পারের দুই ফাঁড়ির কর্তারা একসঙ্গেই সারেন। ব্যাপারটা প্রায় ফ্লাগ মিটিংয়ের মতো করেই অনুষ্ঠিত হয়। দু ফাঁড়ির কমান্ডার, রসিকলাল, বাঁদরওয়ালা কাঞ্জিলাল, নিজামুদ্দি আর নিজামুদ্দির বউ মর্জিনা এই সময় জিরো লাইনে উপস্থিত থাকে। সীমু থাকে রানির কোলে। মর্জিনা, নারী হওয়ার সুযোগে, বাটিতে ভাত মেখে নিজ হাতে সীমুর মুখে তুলে দেয়। সীমু সেই ভাত সামান্যই খায়। এরপরের অংশে কাঞ্জিলালের ভূমিকা হয়ে ওঠে প্রধান। কাঞ্জিলাল রানিকে শেখানোর চেষ্টা করে চামচ দিয়ে সীমুকে ভাত খাওয়ানো শিক্ষা দেওয়ার। সীমু ভাত খাবে কি, রানি কিছুতেই সীমুর মুখে ভাত তুলে দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, চামচ ধরে তাতে ভাত তোলার দক্ষতাই রানির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। একদিন হবে না, আস্তে আস্তে হবে, এই কথা বলে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই বিকেলে উভয় পারের রক্ষী ও প্রহরী প্রতিনিধিরা শূন্যরেখা ত্যাগ করে। মর্জিনা বলে, আমি ডেইলি দুই বেলা করিয়া খাওয়ায়া যামো। অসুবিধা হবার নয়। সবাই তাতে আশ্বস্ত বোধ করে। কারণ এই চার মাসে মর্জিনা একদিনও ফিডারে করে দুধ আনার ব্যাপারটায় গাফিলতি করে নাই।

মর্জিনা দুই বেলা করে দুধের ফিডার নিয়ে যখন আসে, তখন সে সীমুর জন্যে নরম ভাত রেঁধে নিয়েও আসার কাজটা সেরে ফেলে। আর ওদিকে, রানি নিজের দায়িত্বে তাকে দেওয়া শাকসব্জি ফলমূল সীমুর হাতে দিতে শুরু করে। সীমু কাঁচা বরবটি, কিংবা টমেটো, পাকা কলা ইত্যাদি কখনো বা রানির হাতে, কখনো বা নিজেই তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে। এবং উভয় পারে সীমুর শুভানুধ্যায়ীরা উদ্বিগ্ন বোধ করে যে সীমু যে একটা বরবটি ধরেছে এবং সেটা মুখে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তার কায়দাটা, অনেকটা বাঁদরদেরই মতো। আরে বাহে ছোট মানুষ তো বান্দরের মতো করিয়ায় ধরিবে, হামার ছাওয়ালগুলানক দেখেন, অরাও পেনসিলটা, কলমটা দেখমেন বান্দরের নাকানই ধরিয়া থাকে। চিন্তা না করিবেন তো অত। দুই পারের মুরব্বিরা পরস্পরকে সান্ত্বনা দেয়।

পরিমল মজুমদার এরই মধ্যে একদিন বাইসাইকেল দুর্ঘটনায় পতিত হয়। সাইকেলসমেত উঁচু রাস্তা থেকে পাশের খাদে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডের হাড়ে চোট পায়। তার পর থেকে সে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ফলে তার সাংবাদিকতা জীবনের একরকম ইতিই ঘটে। এর আগে সে বাঁদর কর্তৃক শিশু প্রতিপালনের খবরটা প্রকাশের জন্য দৈনিক *সীমান্ত জনপদ* পত্রিকায় পাঠালে পত্রিকার সাব-এডিটর খবরটা সোজা ময়লার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে। তার ধারণা হয়, পরিমলের নাম করে অন্য কেউ খবরটা পাঠিয়েছে, যাতে হয় পরিমলকে অথবা কাগজকে অথবা উভয়কে বিপদে ফেলা যায়। পরিমল বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে, এত বড় খবরটা কেন ছাপা হলো না। পরে তার মনে হয়, খবরটা বোধ হয় সংবাদপত্র অফিসে পৌঁছায় নাই। সে আবারও খবরটা পাঠাবে বলে যখন স্থির করে তখনই তার মেরুদণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে বিছানায় পড়ে যায়। চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে দূরবর্তী শহরের বড় হাসপাতালে বেশ কিছুদিন রাখতে হয়। সেখানে চিকিৎসা ও থাকা দুইই ব্যয়বহুল বিবেচনা হওয়ায় সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে এবং শয্যাশায়ী জীবনযাপন করতে থাকে। ফলে এই খবর আর কোনো কাগজে পাঠানো হয়ে ওঠে নাই। নিজের মাটির তৈরি বাড়িতে পুরোনো শালকাঠের তৈরি খাটে শুয়ে পরিমল মজুমদার কল্পনা করে, সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, আর পত্রিকার হেড অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে সে নিজের হাতে সীমানা আর রানির খবরটা বার্তা সম্পাদকের হাতে তুলে দিচ্ছে। বার্তা সম্পাদক খবরটা পড়ে এতই উচ্ছ্বসিত যে তাকে বসিয়ে চা খাওয়াচ্ছে। মাটির ঘরের দক্ষিণের জানালা দিয়ে বসন্তের বাতাস আসে, বারান্দা থেকে কবুতরের বাকবাকুম ডাক আসে, তার দশ বছরের ছেলে পরিতোষ দৌড়ে এই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসে কী মনে করে আবার বাইরে চলে যায়, পরিমল মজুমদারের আর উঠে বসা হয় না, সীমু ও রানির খবরটা লেখা হয়ে ওঠে না। পঞ্চায়েত ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ছাত্র পড়িয়ে ফেরার পথে হরিহর মজুমদার উঁকি দেয়। পরিমল, তোমারে আইজকা আগের থাকিয়া ভালো বোধ হয়। মনে হয়, সারিয়া উঠতেছ, দাদা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সীমু কিংবা রানির খবরটা যাতে ছাপা না হয় সে ব্যাপারে দুই ফাঁড়ির কমান্ডারদেরই সতর্কতা ছিল। তারা চায় নাই এই খবর ছাপা হোক। কারণ যত দেরি হচ্ছে ততই খবরটা তাদের ভাবমূর্তির জন্য হুমকি হয়ে যাচ্ছে। একটা বাচ্চা না-মানুষি জমিনে থাকে, একটা বাঁদর তার দেখাশোনা করে, আর কোনো পক্ষই এই মানবশিশুটাকে তাদের পারে ঢুকতে দেয় নাই, এটা প্রকাশিত হলে প্রতিক্রিয়াটা কী হবে, সে সম্পর্কে দুই শিবিরের কর্মকর্তারা নিশ্চিত নন। এমনও হতে পারে, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাঁদেরই চাকরি চলে গেল। এই সব ক্ষেত্রে সরকার বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ দায় মাঠপর্যায়ের জোয়ানদের ওপরে চাপিয়ে দিতেই পছন্দ করে। বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেহেতু এই শিশু জন্মানোর ঘটনাটা ওয়াকিফহাল নয়, কাজেই তারাও দায়িত্ব নেবে না। পান থেকে চুন খসার অপরাধে মাঠকর্মীদের চাকরিচ্যুতি চাই কি কোর্ট মার্শালও হয়ে যেতে পারে।

ফলে, ওই অজপাড়াগাঁয়, যেটা কিনা স্থলবন্দর নয় এমন একটা জায়গায়, নাগরিক লোকচক্ষুর অন্তরালে সীমানা ওরফে সীমা ওরফে সীমু রানি নামের এক বাঁদরের কোলে মানুষ হতে থাকে। রানিরও এই কাজে কোনো রকমের শৈথিল্য ছিল না। এলাকার মানুষ প্রচার করে যে রানিরও একটা মেয়ে হয়েছিল, ছোটবেলাতেই রানির মেয়েকে তার পালক বিক্রি করে দেয়। রানির বুক চুয়ে তখন দুধ পড়ত। সে সারা দিন সেই বাচ্চার শোকে কান্নাকাটি করত। রানি মাতৃস্নেহ সীমু নামের এই মানবশিশুর ওপরেই বর্ষণ করে সান্ত্বনা ও আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে। অনেকে এও বলাবলি করে যে, এক বান্দরির বাচ্চা হওয়ার দুই দিনের মাথায় বাচ্চাটা ইলেকট্রিক তারে শক খেয়ে আছড়ে মাটিতে পড়ে মারা গেলে তার মা পাগলপ্রায় হয়ে পড়ে। এই সময় বান্দরি না-মানুষি জমিনে এসে একটা মানবশিশু কুড়িয়ে পায়। ওই মানুষের বাচ্চাটাকেই সে নিজের সন্তান ভেবে বুকে তুলে নেয়। তখন তার বুকে ছিল দুধের নহর। সে নিজ স্তন্য ওই মানবশিশুকে পান করায়। নলচেপাড়া কিংবা হলদিবাড়ি সীমান্তে গেলে না-মানুষি জমিনে এখনো সেই মানুষের বাচ্চা আর বান্দরি মাকে দেখা যাবে।

মানুষ যখন এই সব কাহিনি বর্ণনা করে, তখন অনেকেই

www.amarboi.com

মাইরি বলে, অনেকে কিরা কসম কেটে এমন জোর দিয়ে বলে যে তাদের আর অবিশ্বাস করার জো থাকে না। ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীরও অভাব পড়ে না, যারা বলে, বান্দরটি ওই মানুষের বাচ্চাকে নিজের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে, এই দৃশ্য তারা নিজের চোখে দেখেছে। এমনকি বাঁদর-মা কর্তৃক মানবশিশুকে স্তন্য পান করানোর দৃশ্য ভিডিও করা আছে বলেও অনেকে দাবি করে। আরে বাহে হামার কাছেই সেই ক্যাসেট আছে, এই রকম দাবি করার লোক যখন আপনার সামনে এসে হাজির হয়, এবং চলেন হামার বাড়িত, ভিসিআরে দেখেয়া দেই বলে বুক চাপড়ে ঘোষণা দেয়, তখন আপনার পক্ষে সেই কথা বিশ্বাস করে নেওয়াই সহজ ও সংগত বলে মনে হবে নাকি?

রানি নিজে কিন্তু কাপড় পরে। এটা তাকে কাঞ্জিলালই শিখিয়েছিল। এখন মর্জিনা বা রসিকলাল যখন সীমার জন্য কাপড় নিয়ে আসে, তখন দর্শকদের মধ্যে কোনো বাচ্চা মেয়েকে সেই কাপড় পরিয়ে রানির সামনে মহড়া দেওয়া হয়। তারপর সেই জামা রানির হাতে তুলে দিলে রানি সেটা নিয়ে সোজা তার ছইঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সীমার গায়ে সেটা পরিয়ে দেয়। সীমা আস্তে আস্তে বড় হয়ে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করে। সে সাধারণ মানবসন্তানের মতো হামাগুড়ি না দিয়ে পায়ের হাঁটু নিভাঁজ রেখে চার হাত পা সোজা রেখে এমনভাবে হামাগুড়ি দিতে শুরু করে দিয়েছিল যেন সে একটা বাঁদরের সন্তান। তখন কাঞ্জিলাল রানিকে ইশারা করে যেন সীমাকে না-মানুষি চত্বরের কিনারে আনা হয়, যাতে কিনা সে মানুষ-দর্শকদের কথা ও হাঁটাচলা ইত্যাদি দেখতে পারে ও নকল করতে পারে। সীমু কাছে এলে মানুষ স্থানীয় ভাষায় তাকে ডাকতে শুরু করে, সীমানা সীমানা, সীমা সীমা, সীমু সীমু। আজকা কী খাইছেন বাহে, কিছু খাইবেন, এই জাতীয় প্রশ্নও তারা করে। আর নলচেপাড়ার রক্ষীদের ভাষা নানা রকম হওয়ায় সীমার সঙ্গে অন্য ভাষাভাষীদেরও ব্যতিচিত ঘটে থাকে। এক বছরের মাথায় সীমা দু পায়ে হাঁটা ও সীমা, সীমানা এই সব বলা শুরু করে দেয়। দেড় বছরের মাথায় তার শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পায়, দুই বছরের মাথায় সে প্রায় গরগর করে স্থানীয় উপভাষায় কথা বলা শুরু করে দেয়। কিন্তু সে রানির ভাষাও বুঝতে ও রানিকে তার ভাষা বোঝাতেও সক্ষম হয় বলে অনেকে মনে করে। রানিমাকে ডেকে আনো বললে সীমা একটু দূর থেকেই অদ্ভুত ভাষায় চিৎকার করলে রানি এসে হাজির হয়। তিন বছরের মাথায় সীমু স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। নিজের কাপড় নিজে পরা, নিজের খাবার নিজে খাওয়া তার অভ্যাসে পরিণত হয়। একটা আশ্চর্যের বিষয় হলো, রানি কখনোই সীমুকে নো ম্যান'স ল্যান্ডের বাইরে নিয়ে যায় নাই। যদি সে নিজে এখন সীমুকে ছইয়ের কাছে ফেলে রেখে মাঝেমধ্যেই এপার-ওপার দুই পারের গাছগাছালি চষে বেড়ায়। আর সীমুও দেখা যায়, না-মানুষি জমিনের ভেতরে যে একটা দুটো আমগাছ জামগাছ পেয়ারাগাছ লিচুগাছ আছে, সেসবে সহজেই উঠে পড়তে পারে। গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে সে লাফিয়ে বেড়ায় খুব সহজ ভঙ্গিমায়।

এর মধ্যে নলচেপাড়ার কমান্ডার বদলি হয়ে যায়। হলদিবাড়ির হাবিলদার মিজানের স্থলে নতুন লোক আসে। তারা প্রথম প্রথম বিষয়টাকে বিস্ময়কর মনে করলেও ধীরে ধীরে ব্যাপারটা তাদের কাছেও অতি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আর এখন যেহেতু সীমু বড় হয়ে গেছে, সীমু নামের একটা মেয়ে নো ম্যান'স ল্যান্ডে একটা বাঁদর পোষে আর বাঁদরটা নিয়ে ওইখানে একটা ছইয়ের মধ্যে থাকে, এটাই বরং বেশি প্রচলিত হয়ে যায়। একদা এই বাঁদরটাই তাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, তার কাঁথা বদলে দিয়েছে, এমনকি তার ভেজা নেংটি পাল্টে দিয়েছে, এই কথা এখন কেউ কল্পনাও করে না, এই বিষয়ে তাদের মনে কোনো প্রশ্নও দেখা দেয় না। তারা ধরে নিয়েছে যে সীমা চিরকাল এমনি খুকিই ছিল, আর বাঁদরটাকেই সে পেলেপুষে রেখেছে। এখন জনরব এই যে, সীমু নামের একটি বালিকা একটা বাঁদরশিশুকে মুমূর্ষু অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। সে ওই বাঁদরের বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়, ফিডারে করে দুধ খাওয়ায়, তাকে কোলে পিঠে করে রাখে। ওই বাঁদরের বাচ্চাটা এখন বড় হয়েছে। ওই বিস্ময়বালিকাটি আর তার পোষা বাঁদরটি নলচেপাড়া/ হলদিবাড়ি সীমান্তে না-মানুষি জমিনে একটা বস্তিঘরে বসবাস করে।

হরিহর মজুমদার এই সময়ে নলচেবাড়িতে আসতে শুরু করেন। পরিমল মজুমদারের দাদাটি দেখতে ছোটভাইয়ের ঠিক উল্টো। তার একহারা গড়ন, গায়ের রং ধবধবে ফর্সা, তার মাথায় টাক, শর্ষের তেলের কারণে সেই টাক সর্বদা চকচক করে, দাড়িগোঁফ একেবারেই কামানো, তিনি পরেন সাদা ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি, তাকে একটা চলমান সারস পাখি বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। তিনি কথা বলেন নাকি সুরে। তিনি শিক্ষক মানুষ, ভাবেন, একটা বাচ্চা মেয়ে লেখাপড়া কিছুই করবে না, এটা কী করে হয়। তিনি তাকে লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করেন। সীমু তার সীমারেখার ওপাশে বসে থাকে, আর এ পাশে খোলা আকাশের নিচে একটা ছাতা মাথায় হরিহর মজুমদার একটা ব্লাকবোর্ডে লিখতে থাকেন, অ আ ক খ। তিনি এসব জোরে জোরে পড়তে থাকেন। সীমার পাশে রানিও কখনো কখনো এসে বসে। এখন আর রানি সীমাকে কোলে নিতে পারে না। সীমারই ঘাড়ে বরং রানি উঠতে পারে। তার মাথার উঁকুন পরিষ্কার করে দিতে পারে। সীমা দ্রুতই অ আ ক খ আর ১ ২ ৩ ইত্যাদি শিখে ফেলে। তখন হরিহর মজুমদার তাকে এ বি সি ডি শিক্ষা দিতে থাকেন। এ ফর অ্যাপল বি ফর বল ছাড়িয়ে সীমুর শিক্ষা মাই নেম ইজ সীমানা, আই রিসাইড ইন আ নো ম্যান'স ল্যান্ড পর্যন্ত গড়াতে থাকে।

লেখাপড়ায় সীমু ভালো করে। তবে তার আসল উৎসাহ লেখাপড়ায় নয়, তার উৎসাহ বরং গানে। নলচেপাড়ার সাবেক কমান্ডার তাকে একটা রেডিও কিনে দিয়েছিল। সেই রেডিওতে দুই পারেরই স্থানীয় বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা শোনা যায়। সীমু সেই রেডিও চালাতে পারে। রানিও পারে। দুইজনে রাতের বেলা ঘুমানোর আগে রেডিওতে ভাওয়াইয়া গান শোনে। সীমু যখন ও কি গাড়িয়াল ভাই বলে হাঁক দেয় তখন আশেপাশের মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ করে তার গান শুনতে বাধ্য হয়। হরিহর মজুমদার এটার ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, সে তার ভাই পরিমল মজুমদারের কাছে শুনেছে, সীমুর মায়ের সঙ্গে আগত নারীপুরুষরা তাকে বলেছিল যে সীমার ভাই পল্টু ছিল একজন কাওয়াল। তারও ছিল মধুর মতো গলা। কাজেই সীমু এই সংগীতপ্রতিভাটা বংশানুক্রমিকভাবেই পেয়েছে। শুধু ভাওয়াইয়া নয়, রেডিওতে শুনে শুনে সীমু রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল সংগীতও মুখস্থ করে ফেলে। তার অনুকরণ করার প্রতিভা অতুলনীয়। সে কোনো গান কয়েকবার শোনামাত্র তা হুবহু গেয়ে দিতে পারে।

সীমার বয়স এখন ৭ বছর। ৭ বছর আগের খ্রিষ্টীয় বর্ষের শেষের দিকে তার জন্ম বলে সকলের মনে আছে। ডিসেম্বরের ওই দিনে খুব শীত পড়েছিল, শীতে শালিক পাখি মরে ঝরে পড়ে বাঁশঝাড়ের নিচটা ছেয়ে ফেলেছিল, সেখান থেকেই এই হিসাব বের করা যায়।

ওদিকে ফুলবানু খুবই অসুবিধায় পড়ে। কথায় কথায় এটা চাউর হয়ে যায় যে, রানি তার বুকের দুধ খেয়েছে। বাঁদরছানাকে মানুষ কেন তার বুকের দুধ খাওয়াবে, এই নিয়ে তাকে সমাজের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মর্জিনা তার হয়ে স্থানীয় মাতব্বর নুরুল মুন্সির সঙ্গে ঝগড়া করে যে, রানি ফুলবানুর দুধ খায় নাই, সীমু খেয়েছে। 'হইল সীমু খাইছে, অঁয়ও তো একটা বান্দরের বাচ্চা'—নুরুল মুন্সির এই পাল্টা কুযুক্তির বিরুদ্ধে মর্জিনা গলার রগ ফুলিয়ে ঝগড়া করে, 'সীমা বান্দরের মাইয়া না, মানষের মাইয়া।'

'মানুষ যদিল হয়, তার ধর্ম কী? পরিচয় কী?' নুরুল মুন্সি বলে। কথা বলার সময় তার ঠোঁটের কোণে থুতু জমে।

মাতব্বর নুরুল মুন্সি গং ফুলবানুকে একঘরে করার প্রয়াস পায়। ফুলবানুর শাশুড়ি এমনিতেই অসন্তুষ্ট ছিল ফুলবানুর ওপরে, কারণ সে পর পর তিনবার কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে, তার ওপর তিন নম্বর সন্তানটিকে সে বাঁচাতে পারে নাই, তার ওপর নিজের বুকের দুধ সে বোতলে করে বাইরে পাচার করেছে, এটা ভারি অন্যায় হয়েছে। তারা ফুলবানুকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয় আর ফুলবানুর স্বামী অছির উদ্দিনকে আবারও বিয়ে করার জন্য চাপ দেয়। অছির উদ্দিন লোকটা সহজ সরল, যখন যার কথা শোনে, তার কথাই বিশ্বাস করে। তার বউ ফুলবানু যে অন্যায় করেছে, এইটা যখন বলা হয়, তখন সে তাতে পুরোপুরিই অনুধাবিত বোধ করে। আবার যখন নিজামুদ্দি বাবুর্চি তাকে বোঝায় যে তার বউ খুব সোয়াবের কাম করেছে, একটা মানবশিশুকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, মহানবী (দ.)-এরও দুধমাতা ছিল, এটা জায়েজ, তখন সে ফুলবানু ভালো কাজ করেছে বলেই নিশ্চিত হয়। তবে ফুলবানুকে সে ভালোবাসে আর তার মেয়ে দুটোকেও সে খুবই আদর করে। অন্যদিকে আরেকটা বিয়ে মানেই নতুন আরেকটা

www.amarboi.com

মেয়েমানুষের ওপরে অধিকার লাভ, সেই বিষয়টাও তার কাছে বেশ একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে অছির উদ্দিন, যে হলদিবাড়ি হাটে দোকানদারি করে, আরেকটা বিয়ে করবে কি করবে না এই দোটানায় ভুগতে থাকে।

রসিকলালের বউ কৃষ্ণা, যে নলচেপাড়া থেকে বহু দূরে থাকে, সে এর মধ্যেই দু দুটি পুত্রসন্তানের গর্বিত জননী হয়েছে। কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রসিকলাল তাকে নলচেপাড়ায় নিয়ে এসেছে এবং একখানি ঘর তুলে সেই ঘরে রেখে দিয়েছে। তারা সুখে আছে, যদিও কৃষ্ণা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে যে, রসিকলাল নিজের দুই ছেলে মাখনলাল ও মাধবলালের চেয়ে ওই বান্দরের বাচ্চা সীমুকেই বেশি আদর করে থাকে।

সাত বছরে সীমুর কোনো অসুখবিসুখ হয় নাই। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বাসুদেব ধর বলে, হয় নাই, কারণ আমি রানির মাধ্যমে নিয়মিত ওষুধ পাঠাইছি, হোমিওপ্যাথি মানেই ধনন্তর। হরিহর মজুমদার মনে করেন, রানি নিজেই ওষুধ গাছের পাতা চিনে এনে সীমুকে খাইয়েছে বলেই তার কোনো দিন অসুখবিসুখ হয় নাই। হারবালের কোনো বিকল্প নাই।

সীমুর গানের প্রতিভা বিশেষ করে ভাওয়াইয়া গানের গলার সত্যি কোনো তুলনা হয় না। যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। এখন লোকে রানির তামাশা নয়, সীমুর গান শোনার জন্যই নলচেপাড়া বা হলদিবাড়িতে আসে। তারা মুগ্ধ হয়। হলদিবাড়ির লোকেরা বলে, খুদে গায়কের আসর প্রতিযোগিতায় যদি এই মেয়েটি যায়, তাহলে তাকে কেউ হারাতে পারবে না। সেরার মুকুটটি সেই লাভ করবে। অন্যদিকে নলচেপাড়ার লোকেরা বলে, শিশু প্রতিভা প্রতিযোগিতায় তাকে যদি একবার পাঠানো হয়, তাহলে সে শ্রেষ্ঠ না হয়েই যায় না। দুই পারের টেলিভিশনেই এই দুই অনুষ্ঠানই খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু ওদিকে রসিকলাল, ওদিকে নিজামুদ্দি বাবুর্চি, কেউই কোনো উপায় খুঁজে পায় না মেয়েটিকে ওই না-মানুষি জমিন থেকে বের করে আনার। যে পারেই পাঠানো হোক না কেন, প্রশ্ন তো উঠবেই তার বাপের নাম কী, তার মায়ের নাম কী, আর তার বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায় উঠলেই হলদিবাড়ি, নাকি নলচেপাড়া, এই প্রশ্নের উত্তর তাদের পেতে হবে। আর এই মেয়েটিকে ওই প্রতিযোগিতায় পাঠানো হলে সে যদি সত্যি সত্যি সেরা দশে ঢুকে যায়, তাহলে সবাই জেনেও যাবে যে, সীমার পালক মা একটা বাঁদর। তখন লোকে জিনিসটা কীভাবে নেবে। আর পুরো ব্যাপারটা তদন্ত করে না আবার নিজামুদ্দি কিংবা রসিকলালের চাকরি চলে যায়।

এই সমস্যার অতিরিক্ত নতুন সমস্যা বিশেষ করে রসিকলালকে চিন্তায় ফেলে দেয়। নলচেপাড়া সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রকল্প ঘোষিত হয়। নলচেপাড়াতে বড় বড় চাকায় পেঁচানো তারকাঁটার বেড়া এসে যায়। তারকাঁটা হবে সীমান্তের নলচেপাড়া ভূভাগে, নো ম্যান'স ল্যান্ডকে বাদ দিয়ে। তা হলে সীমু হলদিবাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে, কিন্তু নলচেপাড়ার সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগ থাকবে না। যদিও সে কোনো দিনও না-মানুষি জমিন ছেড়ে কোনো পারেই যায় নাই, তবু চাইলেই হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরা যেত, তার হাতেই কাপড়চোপড় খাবারদাবার যা ইচ্ছা তাই দেওয়া যেত। রসিকলাল, বিশু, বাসুদেব ধর গোল হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। তবে একটা সুবিধা আছে, রানি যেহেতু গাছে চড়া, মানুষের বাড়ির ছাদ থেকে ছাদে লাফিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজে মহাদক্ষ, কাজেই তার মাধ্যমেই জিনিসপাতি সীমুকে পাঠানো যাবে।

সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হরিহর মজুমদারের। তার পাঠদানের কী হবে? একেবারে বেসিকটা শিখায়া দেওয়া গেলে আর লাগে না। কিন্তু বাহে আরও কিছুদিন লাগিল হয়। এই হলো হরিহর মজুমদারের কথা। তিনি ঠিক করেন, তিনি কেবল শিক্ষক নন, তিনি তো একজন কথাসাহিত্যিকও, তিনি সীমুর কথা লিখবেন। তিনি খুব যত্ন করে একটা ফিকশন লিখে ফেলেন। তার লেখা তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভাই পরিমল মজুমদারকে পড়ে শোনালে পরিমল এটাকে তার নিজের লেখা রিপোর্ট বলে দাবি করে। হরিহর বলে, তা কী করিয়া হয়, তুমি তো পল্টুর বাবা-মার খবর আমাকে তেমন করিয়া দাও নাই। এটা আমি নিজে লিখেছি। পরিমল বলে, দাদা তুমি ভুলি গেলা। আমি তো পল্টুর মার কাছ থাকি পুরা কাহিনি শুনিয়া তোমাকে বলি গেলাম।

যা হোক, হরিহরের লেখা কাহিনিটি একটা পূজাসংখ্যায় ছাপানোর জন্য পাঠানো হলে তা গাঁজাখোরি গল্প হিসেবে অমনোনীত হয়। তখন গল্পটা হলদিবাড়ি এলাকার একটা ঈদসংখ্যায় পাঠানো হয়। সেই গল্পটায় শেষটা ছিল পুরাটাই কাল্পনিক ও বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন।

গল্পের শেষটা হরিহর লেখেন এই রকম :

সীমানাকে অবশেষে টেলিভিশনের একটা প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় পাঠানো গেছে। প্রতিযোগিতার নাম এপার ওপার সেরা শিশু শিল্পী। এতে দুই পারের শিশুরাই অংশ নিতে পারবে। কাঁটাতারের বেড়া হয়ে যাওয়ায় সীমানাকে নলচেপাড়া দিয়ে জেলা সদরে আনা যায় নাই। কিন্তু ওই পারে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় তাকে সীমান্ত প্রহরীদের বিশেষ সার্টিফিকেট দিয়ে বৈধভাবেই প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। সেখানে সে বাবার নাম লেখে : পল্টুর বাবা। মার নাম লেখে পল্টুর মা। আর ঠিকানা লেখে : নো ম্যান'স ল্যান্ড, হলদিবাড়ি বিওপি, হলদিবাড়ি।

সীমানা যখন হলদিবাড়ির না-মানুষি জমিন ছেড়ে যায়, সেদিন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। রসিকলাল, বাসুদেব ধর, বিশু, ভবেশ পাগলাসহ নলচেপাড়ার বহু মানুষ কাঁটাতারের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। সীমু সকলকে নমস্কার করে চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে। সবচেয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে রসিকলাল। তার দুই ছেলে মাখনলাল ও মাধবলাল বাবার দুই হাত ধরে থাকে। তার স্ত্রী কৃষ্ণা নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েও থামাতে তাকে ব্যর্থ হলে তার সঙ্গে রাগারাগি করতে থাকে। বলে যে, তুমি আমার সহিত কেন থাকো, ওই বান্দরি রানির সঙ্গে থাকিলেই পারো। অনেক দুঃখের মধ্যেও সেই কথা শুনে নলচেপাড়াবাসী হেসে উঠলে রসিকলাল কান্না থামায় ও বউয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়ে রানি। হঠাৎ করে তার পূর্ণঘর শূন্য হয়ে পড়ে। সে এখন কার সঙ্গে দিন কাটাবে। সারা রাত সে একলা ঘরে ছটফট করে। তার চোখের জল এক মুহূর্তের জন্য শুকায় না। কাঁটাতারের বেড়ার ওপরে চড়ে বসে সে অশ্রুপাত ও রোদন করে। কাঞ্জিলালকে খবর দেওয়া হলে সে নলচেপাড়ায় চলে আসে। ডুগডুগি বাজিয়ে রানিকে ডেকে কাঁধে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে কাঞ্জিলালের সঙ্গে দুই দিন থেকে এক সকালে রানি ওই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে। সে কাঁটাতারের বেড়া লাফিয়ে পার হয়ে তার ছইয়ের ঘরে প্রবেশ করে। তার মনে একটা আশা ছিল, সীমু হয়তো ফিরে এসেছে। কিন্তু সীমু ফেরে নাই দেখে সে খুব মর্মাহত বোধ করে। কারণ বিদায়ের আগে সীমু বাঁদরদের ভাষায় রানিকে বলেছিল, মা, আমি দুদিন পরেই ফিরে আসব। মর্জিনা তাকে সেই রকমই বুঝিয়েছিল। তারা এখান থেকে যাবে জেলা শহরে। সেখানে হবে অডিশন রাউন্ড। সেখান থেকে তারা ফিরে আসবে। তারপর যদি তারা অডিশন রাউন্ডে ভালো করে, তবেই না তারা রাজধানী শহরে যাওয়ার কার্ড পাবে। তখন তারা টেলিভিশনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।

বিদায়ের দিন সকালবেলা মর্জিনা আর নিজামুদ্দির হাত ধরে সীমু না-মানুষি জমিন ছেড়ে প্রথমবারের মতো বাইরের দুনিয়ায় পা বাড়ায়। তারা কিছুটা পথ আল বেয়ে চলে। তারপর তারা একটা রাস্তায় গিয়ে ওঠে। সেখানে তারা একটা রিকশাভ্যানে চড়ে। সীমুর জীবনে এই প্রথম রিকশাভ্যানে আরোহণ। সে বাইরের জগৎটাকে খুবই ভয় ও কৌতূহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারপর তারা মহাসড়কে গিয়ে ওঠে ও রিকশা ছেড়ে দিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করে। মহাসড়ক দিয়ে বড় বড় বাস ট্রাক ছুটে যাচ্ছে, সেই সব দেখে সীমু কিছুটা ভীত, অধিকতর বিস্মিত ও তারও চেয়ে অধিক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তার এটা কী, ওটা কী প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মর্জিনা ও নিজামুদ্দি গলদঘর্ম হয়ে পড়ে।

বাসে চড়ে তারা হলদিবাড়ি পারের জেলা শহরে পৌঁছয়। বাসে মর্জিনা বমি করে, তবে সীমু কোনো সমস্যা করে না। তারা সরাসরি জেলা টাউন হলে যায়। সেখানে তারা হোটেলে ভাত খায়। সীমু জীবনে এই প্রথম চেয়ার-টেবিলে বসে ভাত খাচ্ছে। সে দুই হাত দিয়ে ভাত তুলে খেতে শুরু করলে মর্জিনা তাকে এক হাত দিয়ে খেতে বলে। মর্জিনা খেয়াল করে দেখে, সীমু হাতের বুড়া আঙুলের ব্যবহার জানে না, সে পাঁচ আঙুল একই রকমভাবে ব্যবহার করছে। তারা টাউন হলের বাথরুম ব্যবহার করে। সীমুর জন্যে এ এক কঠিন পরীক্ষা। কারণ তার জীবনে এই প্রথম কোনো কৃত্রিম স্থানে প্রাকৃতিক কর্ম সারা। কিন্তু সীমুর নকল করার প্রতিভা অপরিসীম বিধায় একবার দেখিয়ে দিলেই সে সেই কর্মটি

www.amarboi.com

সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

টাউন হলটি প্রাচীন আমলের, কোনো এক সাবেক জমিদার কর্তৃক নির্মিত, তবে সম্প্রতি তার সংস্কার করা হয়েছে। ওপরে লাল ঢেউটিন। ভেতরে হার্ডবোর্ড কেটে নানা রকমের নকশা করা। দু ধারের দেয়ালে সারি সারি ফ্যান। সামনে সারি সারি লাল রঙের আসন, সেসবে সীমু, নিজামুদ্দি, মর্জিনা জড়সড় হয়ে বসে থাকে। সারা দিন ধরে অডিশন রাউন্ড হয়। সারা বিভাগ থেকে নানা বয়সের শিশুরা এসেছে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। অনেক বাচ্চা দেখে সীমু খুশিই হয়। ছোটবেলা থেকেই সে তার দুই পাশে মানুষের ভিড় দেখতে অভ্যস্ত। আর তিন বছর থেকেই সে গলা ছেড়ে দিয়ে মানুষকে গান শুনিয়ে টাকা আয় করে আসছে। লজ্জা জিনিসটা তার মধ্যে নাই বললেই চলে।

অডিশন রাউন্ডে মাইকে ঘোষণা করা হয়, এবার আসবে তেত্রিশ নম্বর প্রতিযোগী সীমানা। সীমানা এতক্ষণ অন্য বাচ্চাদের দেখে এসেছে, তারা কী করে। কাজেই সে ভয় না পেয়ে মঞ্চে গিয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে গান শুরু করে। সে যেহেতু রেডিওর গান শুনে গান শিখেছে, যন্ত্রসংগীতের জন্য অপেক্ষা করা, কোথায় কতটুকু মিউজিক হবে তা বোঝা তার জন্যে সহজ হয়। সীমানা ও কি গাড়িয়াল ভাই গানটি গেয়ে শোনায়।

সীমানার গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়। একজন বিচারক তাকে ডাকে, সীমানা, তুমি এদিকে এসো। রেডিওতে এই ভাষাও সীমা প্রচুর শুনেছে। সুতরাং কথা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। সে ওই মহিলা বিচারকের কাছে গেলে তিনি তাকে চুমু দেন। এই জিনিসটা এই প্রথম সীমু লাভ করে। তার সাত বছরের জীবনে এর আগে কেউ তাকে কখনো চুমু দেয়নি।

সীমু সহজেই ইয়েস কার্ড পায়। তখন তাকে বলা হয়, পরের দিনই রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হতে হবে। নিজামুদ্দি বাবুর্চি মোবাইল ফোনে কথা বলে তার কমান্ডারের সঙ্গে। কমান্ডার ছুটি মঞ্জুর করে। তারা সেই রাতটি জেলা সদরে হোটেলে কাটায়। সস্তার হোটেল হলেও সীমুর জন্যে সেটাই অনেক বড় পরিবর্তন। এই প্রথম সীমু তার ছইয়ের ঘরের বাইরে কোথাও থাকছে। বন্ধ ঘরে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। উঁচু বিছানায় শুতে তার ভয় লাগে। নরম বিছানায় সে ছটফট করে। তার বারবার রানির কথা মনে হয়। সে মর্জিনাকে বলে, চাচিমা, আমি রানিমার কাছে যামো।

মর্জিনা বলে, মা রে। আসছি যখন চল যাই। একনা সহ্য কর মা।

বিছানায় বসে রানিমা রানিমা বলে কেঁদে সীমু বুক ভাসায়।

পরের দিন সকালবেলা বাসে চড়ে সীমু, নিজামুদ্দি ও মর্জিনা রাজধানীর উদ্দেশে জেলা শহর ছেড়ে যায়।

সীমা এপার ওপার সেরা শিশুশিল্পী প্রতিযোগিতায় ভীষণ ভালো করতে থাকে। সে রানির সঙ্গে ছইয়ের নিচে রেডিও শুনে শুনে নজরুল রবীন্দ্র আধুনিক ভাওয়াইয়া সব গানই ভালো শিখে ফেলেছিল। সে দ্রুতই সেরা দশে চলে আসে। ও পারের ৫ জন এ পারের ৫ জন সেরা দশে আসে। সীমানাকে নো ম্যান'স ল্যান্ডের মানুষ হিসেবে গণ্য করে এ বছর নিয়ম বদল করে ১১ জনকে শীর্ষস্থানে আনা হয়।

তাকে যখন জিগ্যেস করা হয়, তুমি নো ম্যান'স ল্যান্ডে কী করে থাকো? সেখানে তো কোনো মানুষ থাকে না, সীমা উত্তর দেয় : ওয়েল স্যার, আই লিভ ইন নো ম্যান'স ল্যান্ড। আই এম এ উম্যান। সো আই ক্যান ডেফিনিটলি অ্যান্ড রাইটফুলি রিসাইড ইন আ নো ম্যান'স ল্যান্ড। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, এই সব কথা তুমি কার কাছে শিখেছ। তুমি তো ভীষণ চটপটে মেয়ে। সে জবাব দেয় : আমার গুরু হরিহর মজুমদারের কাছে।

টেলিভিশনে এই সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে থাকে। হলদিবাড়ি বাজারের টেলিভিশনের সামনে, যেখানে স্যাটেলাইট আছে, সেখানে সবাই ভিড় করে। নলচেপাড়ায় বিশুর দোকানের পাশের চায়ের দোকানের টেলিভিশনের সামনেও লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চারদিকে সীমানার নাম ছড়িয়ে পড়ে। হলদিবাড়ি ও নলচেপাড়ার লোকেরা তাকে বিপুলভাবে এসএমএস করতে থাকে। সে ফার্স্ট সেকেন্ড একটা কিছু হবে, আর দশ লাখ টাকা ও ৫ বছরের সংগীতবৃত্তি পাবে, এটাই সবার আশা। নলচেপাড়ার লোকেরা যখন সীমার মুখে হরিহর মজুমদারের নাম শোনে, খুশিতে তাদের চোখে জল এসে যায়।

ফুলবানুকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তারা ঠিক করে, তারা হলদিবাড়ি পারের রাজধানীতে যাবে ও সীমানার সাথে দেখা করবে। সেই তো তাদের আসল মেয়ে। ১০ লক্ষ টাকার আসল খেদমতকার তো হবে অছিরুদ্দিই। ফুলবানুর দুধ খেয়ে সীমু বড় হয়েছে, কাজেই সীমুর ওপরে ফুলবানুর দাবিই সর্বাধিক।

রানির তখন বড় একা একা লাগে। নো ম্যান'স ল্যান্ডের ছইয়ের নিচে তার ভালো লাগে না। তার মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যেদিন মর্জিনা আর নিজামুদ্দি এসে সীমুকে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সীমু খুব কাঁদছিল। বারবার ছুটে আসছিল রানির বুকে। রানিকে কোলে নিয়ে অনেক আদর করেছিল সীমু। তারপর সে চলে যায় না-মানুষি সীমার বাইরে।

ভবেশ পাগলা আর মজনু দেওয়ান সীমান্তের দুই পারে কাগজের বানানো মাইকে ঘোষণা দিতে থাকে, ভাইসব, আজ রাত্রি ৮টা ৩৫ মিনিটে আপনারা দেখুন এপার ওপার সেরা শিশুশিল্পী প্রতিযোগিতা। টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হইবে। ইহাতে অংশ নিয়াছেন নলচেপাড়া ও হলদিবাড়ির কৃতী কন্যা সীমানা। আপনারা দলে দলে টেলিভিশনের সামনে হাজির হউন আর সীমানাকে বেশি বেশি করিয়া এসেমেস করুন।

এই রাত্রিবেলা ছইয়ের নিচে একা একা বসে থাকতে রানির ভালো লাগে না। সে ঠিক করে কাঞ্জিলালের বাড়ি যাবে। কাঞ্জিলালের বাড়িতে টেলিভিশন এসেছে। কাঞ্জিলালের বড় ছেলে কুয়েতে থাকে, সেই বাবার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে। এপার ওপার সেরা শিশুশিল্পী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটা সেই টেলিভিশনে দেখা যায়। এর আগে কাঞ্জিলাল তাকে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। তখন টেলিভিশনের পর্দায় সে তার মেয়ে সীমুকে গান গাইতে দেখেছে। কাঞ্জিলাল তাকে আজও নতুন কাপড়চোপড় দিয়ে গেছে। সেই কাপড় সে পরিধান করে। লাল রঙের জামা, লাল রঙের পাজামা। আর একটা ওড়না। রানি সেটা পরিধান করে। তার লেজ পায়জামার আড়ালে থাকে। সে শখ করে ওড়নাটা মাথায় পেঁচায়। তখন রাত নয়টা মতো বাজে। কাঁটাতারের বেড়া সে দ্রুত বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। দুপাশেই সার্চলাইট আছে। সেই সার্চলাইটে একটা মেয়েকে কাঁটাতারের বেড়া বাইতে দেখা যায়। তার মনে শুধু একটাই চিন্তা, ঠিক সময়ে কাঞ্জিলালের বাড়ি পৌঁছে সে সীমাকে টেলিভিশনে দেখতে পারবে তো। শীতের সেই রাতটাতেও কুয়াশা ছিল, ফলে সবকিছু স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। সে যখন কাঁটাতারের বেড়ার একেবারে উপরের ধাপে ওঠে, তখন খানিকটা দূরে একটা তর্জনী একটা ট্রিগারের দিকে নেমে আসতে থাকে। কাকের দল কাকা রবে মাতম করে গাছের ডাল ছেড়ে আকাশে ওড়াউড়ি করতে থাকে। গোয়ালে গরুরা লাফিয়ে ওঠে বুঝি গলার দড়ি ছিঁড়ে ফেলবে। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। শেয়ালের দল চুপটি মেরে যায়। কাঠবিড়ালিরা গাছগাছালির কোটর থেকে চকিতে মুখ বের করে আবার গর্তেই মুখ লুকায়। রসিকলালের বুকে ব্যথা করে। কাঞ্জিলালের হাত থেকে জলের গেলাস পড়ে যায়। সীমু হোটেল রুমে বসে টেলিভিশন দেখতে দেখতে মর্জিনা ও নিজামুদ্দিকে বলে, চাচিমা, আমার জানি কেমতন কেমতন লাগে। কাম নাই হামার প্রতিযোগিতা করার। চলেন হামরা ফির হামার হলদিবাড়ি নলচেপাড়াত ফিরিয়া যাই। হামার না-মানুষি জমিনত যাই। মোর ওই ছইয়ের ঘরই ভালো। মোর খালি ক্যান জানি রানিমার কথা মনত আইসে। মোর মনটা কয়, রানিমা বুঝি কান্দি কান্দি কইতেছে, ও কি ও আরেকবার আসিয়া, সোনার চান মোক যাও দেখিয়া। মর্জিনা সীমুকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। সীমুর মনে হয়, তার রানিমার বুকের মধ্যে যে ওম, যে আরাম, চাচিমার বুকের মধ্যে ঠিক সেইটা যেন নাই।

তখনই নলচেপাড়া-হলদিবাড়ি সীমান্তে একটা গুড়ুম শব্দ হয়। একটাই শব্দ। আর তাতেই রানির শরীরখানা কাঁটাতারের গায়ে চিরস্থির হয়ে ঝুলে পড়ে।

হরিহর মজুমদারের লেখা এই ফিকশনটি হলদিবাড়ির পূর্বপারের কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নাই। আপনারা যদি এই লেখাটি পড়ে থাকেন, তাহলে বুঝবেন এটাই সেই লেখা। তা হলে আপনারা এই ঠিকানায় ই-মেইল করে আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন : হরিহরমজুমদার—জিমেইল.কম।

হরিহর মজুমদারকে যদি আপনারা জানান যে লেখাটি আপনাদের কেমন লেগেছে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

anisulhoque1971@gmail.com

মেঘের উপর বাড়ি (২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আহমেদ

উপন্যাস মেঘের উপর বাড়ি(২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আহমেদ .mbt-email{ background:url(http://www.amarboi.net /img/0f68671e.png) no-repeat 0px 12px ; width:300px; padding:10px 0 0 55px; float:left; font-size:1.4em; font-weight:bold; margin:0 0 10px 0; color:#686B6C; } .mbt-emailsubmit{...

Read more

সেই দিন সেই রাত্রি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেই দিন সেই রাত্রি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় .mbt-email{ background:url(http://www.amarboi.net /img/0f68671e.png) no-repeat 0px 12px ; width:300px; padding:10px 0 0 55px; float:left; font-size:1.4em; font-weight:bold; margin:0 0 10px 0; color:#686B6C; } .mbt-emailsubmit{ background:#9B9895;...

Read more

চার্চিলের গোপন যুদ্ধ - তানভীর মোকাম্মেল

চার্চিলের গোপন যুদ্ধ তানভীর মোকাম্মেল ছেলেবেলায় মায়ের কাছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের গল্প শুনেছি: কীভাবে 'মা এট্টু ফ্যান দাও' বলে কাতরাতে কাতরাতে কলকাতার রাস্তায় মরে পড়ে থাকত অভুক্ত, কঙ্কালসার, শীর্ণ...

Read more

নারী পর্ব ০৯ - হুমায়ূন আজাদ

ডাউনলোড ক্লিক করুন নারী পর্ব ০৯ - হুমায়ূন আজাদ এবারের পর্ব "বালিকা" বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়, শত বছর পূর্বেই তিনি বলে গেছেন, 'আপনারা হয়তো শুনিয়া আশ্চর্য...

Read more

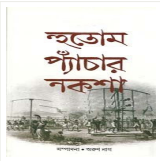

হুতোম প্যাঁচার নকশা

ডাউনলোড ক্লিক করুন হুতোম প্যাঁচার নকশা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বইটিতে কলকাতার সামাজিক ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এবং কলকাতার কথ্য ভাষাকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাংলা গদ্যের উন্নয়নে...

Read more

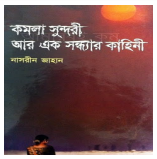

কমলা সুন্দরী আর এক সন্ধ্যার কাহিনী নাসরীন জাহান

ডাউনলোড ক্লিক করুন কমলা সুন্দরী আর এক সন্ধ্যার কাহিনী নাসরীন জাহান .mbt-email{ background:url(http://www.amarboi.net /img/0f68671e.png) no-repeat 0px 12px ; width:300px; padding:10px 0 0 55px; float:left; font-size:1.4em; font-weight:bold; margin:0 0 10px...

Read more

এখনো স্বপ্ন দেখায় - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ডাউনলোড ক্লিক করুন এখনো স্বপ্ন দেখায় - মুহম্মদ জাফর ইকবাল আপনাদের সহযোগীতা আমাদের একান্ত কাম্য। তাই যদি বইটি ভালো লেগে থাকে তাহলে দুচার লাইন লিখে আপনার অভিমতগুলো জানিয়ে...

Read more

সমরেশদা - মিহির সেনগুপ্ত

সমরেশ বসু (১১ ডিসেম্বর ১৯২৪-১২ মার্চ ১৯৮৮)। ছবি : নাসির আলী মামুন সমরেশদা - মিহির সেনগুপ্ত সমরেশদার কিছু খুচরো স্মৃতি মিহির সেনগুপ্ত তোমার মধ্যে একটা লেখার প্রবণতা আছে...

Read more

Buy Now Sarodia 2011

Receive New Bangla Books in your Inbox by submitting your Email ID.

Enter email address here | Submit

340 readers | Like 2K

BY FEEDBURNER

If You Like Us, Click On +

77

For Mobile Browser Click Here
m.amarboi.com

RECENT POSTS | COMMENTS

মেঘের উপর বাড়ি (২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আহমেদ
28 08 2011

সেই দিন সেই রাত্রি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
10 08 2011

চার্চিলের গোপন যুদ্ধ - তানভীর মোকাম্মেল
10 08 2011

আমার বই পাঠকদের জন্য একটি প্রশ্ন
10 08 2011

নারী পর্ব ০৯ - হুমায়ূন আজাদ
09 08 2011

সুইসাইড - রফিকুর রশীদ
05 08 2011